প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৯ ♦ ১৬ - ২২ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টবিশ্বাস পরিপক্কতার যুতসই পালকীয় পদক্ষেপ

গৃহমণ্ডলী : আমরা দীক্ষিত-আমরা প্রেরিত

স্যালুট : বীর মুক্তিযোদ্ধা ফাদার হোমরিক

শিক্ষা ব্যবস্থায় করোনাঘাত ও আমাদের করণীয়

পিতৃতুল্য আদর্শ পালক ও খ্রিস্টসেবক আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি

মহাযাত্রার ৫ম বৎসর

চিত্রা কস্তা

জন্ম : ৬ অক্টোবর, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ (তিরিয়া, নাগরী ধর্মপল্লী)
মৃত্যু : ৮ আগস্ট, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ (নিউইয়র্ক, আমেরিকা)

চিত্রা, বোন আমাদের আজ বলবে না তুই কেমন আছিস। কেননা, তুই যে মহাসুখে আছিস তা আমরা জানি। বাবা, মা যে এখন তোর কাছেই রয়েছে। তাই বাবা, মাকে নিয়ে ভাল থাকিস আর আমাদের জন্য প্রার্থনা করিস। আমরা অনাথ হয়ে গেলাম চিত্রা। তবে তোর কষ্টগুলো হয়তো কোনদিনই আমরা ভুলতে পারব না। ক্যান্সারের যে এত কষ্ট উপলব্ধি করলে তখনই দম বন্ধ হয়ে যায়। আবারও ফিরে আসিস এই নিষ্ঠুর দুনিয়ায়। এই পৃথিবী আমাদের অনেক কিছু উপহার দিল। সাথে সইবার শক্তি দিও প্রভু। ভাল থাকিস। ♥♥♥♥♥

স্বর্গধামে প্রথম বৎসর

মা, তোমাকে জানাই বিনম্র ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। মাগো, আমাদের ছেড়ে এতগুলো দিন তুমি কেমন করে আছ আমি বিশ্বাস করতে পারি না মা। আমরা ভাল নেই মা। এই পৃথিবী এত নিষ্ঠুর কেন! মা ছাড়া যে এত কষ্ট আগে কখনো বুঝতে পারিনি কষ্টটা দেখাতে পারছি না। তবে ভিতরটা যেন প্রতিনিয়ত একেকটা দিন ঠুকরে-ঠুকরে খাচ্ছে। মা, আমাদের এতগুলো দুঃখ কষ্ট জমা হতে হতে এখন আমরা বাকহীন হয়ে পড়ছি। আমাদের মুখের কোন ভাষা নাই, আমাদের দেহ দুর্বল, অসাড় হয়ে পড়ছে। যার মা নাই তার দুনিয়ায় কিছু নাই। কথাটা একদম সত্য। মা, ছাড়া বেঁচে থাকা এই জীবনের কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না।

মা, আমরা তোমাকে অনেক ভালবাসি। আমাদের বিশাল ভালবাসা দিয়ে তোমার ঋণ আমরা কখনো শোধ করতে পারব না। ছয় ছেলে-মেয়েকে নিয়ে একাই অনেক পথ হেঁটে ছিলে মা। সেই সময়ে সেই পথ ছিল কষ্টের, ধৈর্যের, ত্যাগের। বাবার বিদেশ জীবনে তুমি একাই আমাদেরকে সুন্দর গঠন দিয়েছিলে মা। তাই তো আমরা এত দূর এগুতে পেরেছিলাম। জীবনকে স্বার্থক করতে পেরেছিলাম শুধু তোমার জন্য মা। আমরা তোমার প্রশংসা ও গৌরব করি এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

মা, অনেক বড় মনের মানুষ ছিল। অত্যন্ত সাহসী, কঠোর পরিশ্রমী ও হিসাবী ছিল। হে বন্ধু পাঠকগণ, আমাদের মা বোনের জন্য প্রার্থনা করবেন। হে পিতা, তোমার এই সন্তানদেরকে স্বর্গে তোমার কুলে স্থান দিও। সাধ্বী এথেল, সাধ্বী থেক্‌লা করে রেখ। এই প্রার্থনা তোমার চরণে রাখি। আমেন।

নিলু এথেল কস্তা
জন্ম : ১৭ জানুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ (করান)
মৃত্যু : ১৭ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ (তিরিয়া)
নাগরী, কালীগঞ্জ

হতভাগারা –
চন্দ্রা, চন্দন, চঞ্চল, চামিলি ও চুমকী।

বিজ্ঞ/১২১/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ২৯
■■■■■ ১৬ - ২২ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ০১ - ০৭ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সুষ্ঠু-সমন্বিত পরিকল্পনার সাথে বাস্তবায়নেও জোর দিতে হবে

যেকোন ধরনের কর্মকাণ্ড সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে একটি সঠিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। একটি দেশের উন্নয়ন করতে গেলে প্রয়োজন একটি সঠিক ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা। আর বিভিন্ন প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং হবে। তবে সার্বিক উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনার বিকল্প নেই। শুধু এক খাতের প্রভূত উন্নয়ন হলেও তা প্রকৃত উন্নয়ন নয়। তাই যেকোন পরিকল্পনায় উন্নয়নের সার্বিক দিকটা চিন্তা করতে হয়। সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে কোন কোন সময় নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ঠিকই কিন্তু একই সময় সম্পর্কযুক্ত অন্য ক্ষেত্রগুলোকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। তবেই পরিকল্পনা সুষ্ঠু ও সমন্বিত হবে।

করোনাকালীন এই সময়ে আমাদের বাংলাদেশে সমন্বিত সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন কতটা জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ তা আপামর জনগণ তীব্রভাবে অনুভব করেছে। কোভিড-১৯ এর উৎসস্থল চীনে হওয়ায় প্রথমদিকে সরকার এবং জনগণ উভয়পক্ষই খুব হালকাভাবে বিষয়টিকে গ্রহণ করে। যখন ধীরে-ধীরে তা বিভিন্ন দেশে বিস্তার পেতে থাকে তখনও পর্যন্ত আমাদের সচেতনতা আসেনি। কতিপয় তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের বক্তব্য-বয়ানে সহজ-সরলপ্রাণ বিশ্বাসী মানুষ মনে করতে থাকে করোনা তাদের স্পর্শ করবে না। মানুষের জীবন রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও সেই বয়ানে প্রভাবিত হতে পারেন। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় প্রথম কয়েক মাসে করোনারোধে তেমন কোন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপই নেই। সময়ের পরিক্রমায় আমাদের দেশেও যখন করোনার নির্মম উপস্থিতি বাড়তে থাকে তখন সকল মহল নড়ে-চড়ে বসে। হঠাৎ করেই সকল সভা-সমাবেশ বন্ধ করা হয়। মানুষের সমাগম যাতে না হয় তার জন্য সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়, ধর্মীয় উপাসনায় সমাবেশে ভীষণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, গণপরিবহণ বন্ধ করা হয়, পরবর্তীতে শর্তসাপেক্ষে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়, সাধারণ ছুটির ঘোষণা করে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়। করোনাভাইরাস থেকে মানুষের জীবনকে বাঁচানোর জন্য এমনিতর আরো অনেক পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য স্বাস্থ্য ও তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে অবিরাম প্রচার চালানো হচ্ছে। কিছুটা সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্যবিধি প্রয়োগ করতে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু তারপরও করোনাসঙ্কটকে আমরা যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পারছি বলে মনে হচ্ছে না। অনেক ভাল-ভাল পরিকল্পনা ও নির্দেশনা তৈরি হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু তাতে সুষ্ঠু ও সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব আছে। যেমন: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া কিভাবে চলবে, শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি কিভাবে আসবে তার কোন নির্দেশনা নেই। শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলে কতদিন এর কর্মীরা চুপচাপ বসে থাকবে, উপার্জনহীন কর্মীরা কিভাবে জীবিকা-নির্বাহ করবে; স্বাস্থ্যবিধি না মানলে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তারও সুনির্দিষ্ট কোন দিক-নির্দেশনা নেই। গণপরিবহন ও জনসমাবেশের জন্য নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু তা বাস্তবায়িত কিভাবে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এখনই অনেক গণপরিবহনে বিধিনিষেধ অমান্য করে অনেক যাত্রী নিয়ে যাত্রা করছে। এতে একদিকে রোগ সংক্রমনের ঝুঁকি যেমনি বাড়ছে তেমনি যাত্রীকে অতিরিক্ত ভাড়াও গুণতে হচ্ছে। সব সময় মাস্ক পড়া ও কর্মস্থলে স্যানিটাইজার ব্যবহার/সাবান পানি দিয়ে বার-বার হাত ধোয়া কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে হলে প্রশাসনকে আরো কঠোর হতে হবে। অনেক মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজে কঠিন হওয়াটা জনবান্ধব সরকারের পরিচয় হবে। তাই করোনা সঙ্কটকে মোকাবেলা করতে হলে সমন্বিত পরিকল্পনার সাথেই তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনার কৌশল রাখতে হবে।

মাণ্ডলীকভাবেও পালকীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রতিবছরই প্রত্যেকটি ধর্মপ্রদেশ নিজেদের প্রয়োজন ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা থাকার কারণেই একটি ধর্মপ্রদেশ আপন গতিতে পরিচালিত হয়। আর পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাই একটি ধর্মপ্রদেশকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত রাখে। সঙ্গত কারণেই পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। করোনা সঙ্কটের কালেও সুষ্ঠু পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বড় সমাবেশ ঘটিয়ে পালকীয় কর্মশালা না হলেও পালকীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের মতামত নেওয়া হোক। যাতে করে সুষ্ঠু-সমন্বিত পালকীয় পরিকল্পনা তৈরি হয় এবং সকলের অংশগ্রহণে তা বাস্তবায়িত হয়ে মিলন-সমাজ হয়ে ওঠুক বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী। ✝

মঙ্গলবাণী

"ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন মঙ্গলদানে, ধনীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন শূন্য হাতে।" - লুক:১:৫৩

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

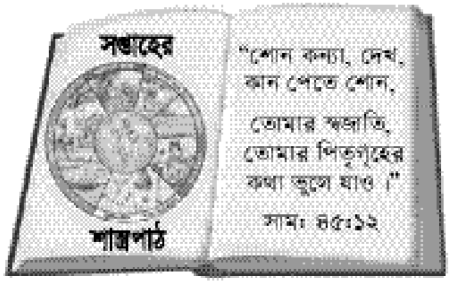

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৬ - ২২ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১৬ আগস্ট, রবিবার
প্রত্যাদেশ ১১: ১৯, ১২: ১-৬ক, ১০কখ, সাম ৪৫: ১০-১২, ১৩-১৪, ১ করি ১৫: ২০-২৭, লুক ১: ৩৯-৫৬

১৭ আগস্ট, সোমবার
এজেকিয়েল ২৪: ১৫-২৪, সাম (২য় বিবরণ) ৩২: ১৮-২১, মথি ১৯: ১৬-২২

১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার
এজেকিয়েল ২৮: ১-১০, সাম (২য় বিবরণ) ৩২: ২৬-২৮, ৩০, ৩৫-৩৬, মথি ১৯: ২৩-৩০

১৯ আগস্ট, বুধবার
সাধু জন ইউদেস, যাজক, স্মরণ দিবস
এজেকিয়েল ৩৪: ১-১১, সাম ২৩: ১-৬, মথি ২০: ১-১৬

২০ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
সাধু বার্ণার্ড, মঠাধ্যক্ষ ও আচার্য, স্মরণ দিবস
এজেকিয়েল ৩৬: ২৩-২৮, সাম ৫১: ১০-১৩, ১৬-১৭, মথি ২২: ১-১৪

২১ আগস্ট, শুক্রবার
সাধু ১০ম পিউস, পোপ, স্মরণ দিবস
এজেকিয়েল ৩৭: ১-১৪, সাম ১০৭: ২-৯, মথি ২২: ৩৪-৪০

২২ আগস্ট, শনিবার
বিশ্ব রাণী ধন্য মারীয়া, স্মরণ দিবস
ইসাইয়া ৯: ১-৬, সাম ১১২: ১-৮, লুক ১: ২৬-৩৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৬ আগস্ট, রবিবার
+ ১৯৩৮ সিস্টার এম রোজ বার্ণার্ড গেহ্‌রিং সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৩৯ ব্রাদার ওয়াল্টার জে. রেমলিংগার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭১ ফাদার যাকোব এ. কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৮৬ সিস্টার স্ট্যানিসলাউস এমসি

১৭ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯৮৬ সিস্টার এ্যামি সেন্ট-জামেইন সিএসসি
+ ১৯৯৯ ব্রাদার আখিলা ল্যানিয়েল সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯১১ সিস্টার আন্দ্রে বার্ণার্ড এসএসএমআই (ঢাকা)
+ ১৯৯৭ ফাদার জেরাল্ড ম্যাকম্যাহান সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফাদার দান্তে বের্তোলি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০২ সিস্টার মেরী ইগ্নাসিইস এসএমআরএ (ঢাকা)

১৯ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৮৩ সিস্টার জুডি স্যল এসএসএমআই
+ ১৯৮৪ ব্রাদার ডোনাল্ড ডব্লিউ স্মিট্‌জ সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯২ ব্রাদার চার্লস বিবো সিএসসি (ঢাকা)

২০ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫১ ফাদার জাঁ-মারী ফ্লিওরী সিএসসি (ঢাকা)
২২ আগস্ট, শনি ৭ ভাদ্র
+ ১৯৩৪ ফাদার পিয়ের রলে সিএসসি

খ্রিস্টমণ্ডলীতে দীক্ষাস্নান

১২২৮: দীক্ষাস্নান হল জলের এক অবগাহন যার মাধ্যমে ঈশ্বরের পরমবাণীর "অক্ষয়শীল এক বীজ" জীবনদায়ী ফল উৎপন্ন করে। সাধু আগষ্টিন দীক্ষাস্নান সম্বন্ধে বলেন: "বাণী বস্তুগত উপাদানে আনীত হয়, এবং তা হয়ে ওঠে একটি সংস্কার।"

গ) দীক্ষাস্নান সংস্কার কিভাবে উদ্‌যাপন করা হয়?

খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ

১২২৯: প্রেরিতদূতদের সময় থেকে, খ্রিস্টান হওয়ার ধারা সম্পন্ন হয়েছে একটি ধারা ও কয়েকটি ধাপে প্রবেশের মধ্যদিয়ে। এই যাত্রা দ্রুত অথবা ধীর গতিতে চলতে পারে; তবে বিশেষ কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকতেই হবে: ঐশবাণী ঘোষণা, মন-পরিবর্তনসহ মঙ্গলবার্তা গ্রহণ, ধর্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তি, দীক্ষাজলে অবগাহন, পবিত্র আত্মার অভিবর্ষণ এবং খ্রিস্টপ্রসাদীয় মিলনভোজে প্রবেশাধিকার।

১২৩০: খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশধারা যুগে-যুগে অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলোতে খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশধারার উল্লেখযোগ্য বিকাশ সাধিত হয়েছে। দীর্ঘ দীক্ষাপ্রার্থীকালে অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রস্তুতিমূলক বহু অনুষ্ঠানাদি, যেগুলো ছিল দীক্ষাপ্রার্থীদের প্রস্তুতির পথে ঔপাসনিক বিশেষ-বিশেষ অনুষ্ঠান এবং যেগুলোর পরিসমাপ্তি ঘটেছে প্রবেশ-সংস্কারসমূহের উদ্‌যাপন-অনুষ্ঠানে।

১২৩১: যেখানে শিশু দীক্ষাস্নান এই সংস্কার উদ্‌যাপনের প্রচলিত ধরনে পরিণত হয়েছে, সেখানে খ্রিস্টীয় জীবনের প্রস্তুতির বিভিন্ন ধাপগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে একত্রিত করে একটি ক্রিয়াতে সমন্বিত হয়েছে। শিশু দীক্ষাস্নানের প্রকৃতিগত কারণেই দীক্ষাস্নানোত্তর ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দীক্ষাস্নানের পরে ধর্মশিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কারণেই শুধু নয়, অধিকন্তু ব্যক্তি জীবনে বেড়ে উঠার মধ্যে দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহ পুষ্পিত হওয়ার উদ্দেশেও ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১২৩২: দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা লাটিন মণ্ডলীর জন্য "কতিপয় সতন্ত্র ধাপসম্বলিত বয়স্কদের জন্য দীক্ষাপ্রার্থীকাল" পুনঃপ্রচলন করেছে। এই ধাপগুলোর জন্য ব্যবহৃত অনুষ্ঠান-রীতি বয়স্কদের জন্য দীক্ষারীতিতে (RCIA) পাওয়া যাবে। মহাসভা এই মর্মে আরও অনুমতি দিয়েছে: "মিশন দেশগুলোতে খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যগত পদ্ধতির অতিরিক্ত উক্ত অনুষ্ঠান-রীতির কিছু-কিছু উপাদান ব্যবহার করা যেতে পারে, যেগুলো ইতোমধ্যেই কোন-কোন এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যবহৃত এবং যতদূর সম্ভব সেগুলোকে খ্রিস্টীয় অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সঙ্গে উপযোগী করা যায়।

১২৩৩: সাম্প্রতিককালে লাতিন ও প্রাচ্য সকল অনুষ্ঠান রীতিতেই বয়স্কদের খ্রিস্টীয় জীবনে দীক্ষা শুরু হয় দীক্ষাপ্রার্থীকালে প্রবেশের মধ্যদিয়ে এবং সমাপ্তি ঘটে তিনটি প্রবেশ সংস্কার, অর্থাৎ দীক্ষাস্নান, দৃঢ়ীকরণ ও খ্রিস্টপ্রসাদ একই সঙ্গে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে এবং তার পর-পরই দেওয়া হয় দৃঢ়ীকরণ ও খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার, যদিও রোমীও মণ্ডলীর অনুষ্ঠান রীতিতে শিশুদের দীক্ষাস্নানের পরে অনেক বছরের ধর্মশিক্ষার উত্তরকালে দৃঢ়ীকরণ ও খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার প্রদান করা হয়, যে খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার খ্রিস্টীয় জীবন-প্রবেশে শীর্ষস্বরূপ।

দীক্ষাস্নান-অনুষ্ঠানের নিহিত রহস্য

১২৩৪: দীক্ষাস্নান সংস্কারের অর্থ ও অনুগ্রহ এই সংস্কার-অনুষ্ঠানের রীতিতে স্পষ্ট। এই সংস্কারের চিহ্নের দ্বারা প্রকাশিত এবং নবদীক্ষাস্নাত প্রতি ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

১২৩৫: ক্রুশের চিহ্ন, যা অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক অংশবিশেষ; যে-ব্যক্তি খ্রিস্টেরই হয়ে ওঠবে তাকে খ্রিস্টের মুদ্রাঙ্কন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়; আর ক্রুশের চিহ্ন মুক্তির সেই অনুগ্রহকেও প্রকাশ করে যা খ্রিস্ট ক্রুশের দ্বারা আমাদের জন্য অর্জন করেছেন॥

ফাদার যোহন মিন্টু রায়

সাধারণকালের ২০তম রবিবার

১ম পাঠ : ইসাইয়া ৫৬:১, ৬-৭

২য় পাঠ : রোমীয় ১১: ১৩-১৫, ২৯-৩২,

মঙ্গলসামাচার : মথি ১৫: ২১-২৮

মূলসুর : সকলের জন্য সৃষ্টিকর্তার দয়া, ভালবাসা ও পরিত্রাণ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য।

ঈশ্বরের ভালবাসা

খ্রিস্টেতে ভাই-বোনেরা, আজকের উপদেশ-সহভাগিতা শুরু করা যাক একটি ছোট্ট গল্প দিয়ে।

এক সাগরে এক মা মাছ বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল খাবারের সন্ধানে! ঘুরতে-ঘুরতে আর এক মা মাছের সাথে দেখা। এবার কথা হচ্ছে দুই মা মাছের মধ্যে। প্রথম মা মাছ বলল- মানুষেরা সাগরে ময়লা ফেলছে ও দিন-দিন সাগরের জল দূষিত হয়ে যাচ্ছে এবং এজন্য এখন খাবার যোগাড় করা কঠিন। চল আমরা অন্য কোন সাগরে চলে যাই। তখন বাচ্চা মাছ মাকে জিজ্ঞেস করছে- মা, সাগর কোথায়? আমরা সাগর দেখবো! তখন মা মাছ বাচ্চাদের বলে- "দূর বোকা! এটাই তো সাগর, আমরা তো ডুবে আছি সাগরেরই জলে!"

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আমরা ঐ ছোট্ট মাছটির মতো বুঝি বা না বুঝি, অনুভব করি বা না করি, আমাদের হৃদয় গভীরে চিন্তা করি বা না করি- বাস্তব সত্য হলো-মাছের সাগরে ডুবে থাকার মতোই আমরা ডুবে আছি বাতাসের সাগরে, প্রতিটি নিশ্বাসে-নিশ্বাসে আমরা যে অক্সিজেন গ্রহণ করছি, নতুন জীবন পাচ্ছি তাও তো ঈশ্বরেরই দান, ঈশ্বরেরই ভালবাসা। কবিতার ভাষায় বলা যায়-"বাতাসের দৌড়-ঝাঁপ দশ দিগন্তে / নিশ্বাসে-নিশ্বাসে ভালবাসা নেয়/ মানুষ ও জীবকূলদল/ ঈশ্বরের ভালবাসায় নিমজ্জিত/ মানুষ ও প্রকৃতি জীবন পায়/ ভালবাসার গতিতে-স্পর্শে।"

সৃষ্টিকর্তা পিতা ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি জীবকে বিশেষভাবে তাঁর ভালবাসার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট সকল মানুষকে ভালবাসেন অফুরান ও উদারভাবে। সৃষ্ট মানুষের আত্মা তাই তো সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরেকে পেতে সদাই তৃষিত। তবে দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো এই-মানুষের পাপ-স্বভাব মানুষকে বার-বার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর ও ভাই-বন্ধু মানুষের সাথে সম্পর্কে ফাটল ধরায়, ঈশ্বর ও মানুষের কাছ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা পিতা ঈশ্বর সর্বদাই মানুষকে ক্ষমা করে তাঁর চিরসুখ-আনন্দ ও শান্তি রাজ্যের পথে পরিচালিত করেন। পাপী-তাপী, ভাল-মন্দ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই ঈশ্বরের এই উদার ভালবাসার আবেষ্টনে তৃপ্ত-সুস্থ-জীবন্ত হয়ে ওঠে।

আহ্বান : তাই আজকের বাণীপাঠগুলি বিশেষত মঙ্গলসমাচার আমাদের আহ্বান করে-

ক) আমরা যেন পিতা ঈশ্বরের সর্বজনীন, বিশ্বজনীন ভালবাসায় বিশ্বাস করে সকলের পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা ও কাজ করি এবং

খ) পরিত্রাণ লাভ করতে আমরা যেন সকল মানুষকে ভালবাসি, সেবা করি ও প্রার্থনায় জীবন-যাপন করি।

সকল মানুষের প্রার্থনা-গৃহ

প্রথম পাঠে আমরা শুনেছি হতাশা-নিরাশা ও বন্দিদশার মাঝেও ইস্রায়েল জাতির মানুষকে আশার বাণী শোনানোর কথা প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থ থেকে। তিনি বিজাতীয় যত মানুষকেও শোনাচ্ছেন মহা আশার বাণী "যে ন্যায়নীতি মেনে চলবে, সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করবে, ধর্ম-কর্ম করবে সে পরিত্রাণ লাভ করবে।" প্রবক্তা ইঙ্গিত দিয়েছেন-একদিন যেন আমরা হয়ে ওঠব একই পরিবার, যেন এক 'বিশ্ব-পরিবার' এবং সমাজে-বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায্যতা ও শান্তি। সেদিন ভগবানের গৃহ 'জেরুসালেম মন্দির' হয়ে ওঠবে সকল জাতির প্রার্থনাগৃহ।

খ্রিস্টেতে ভাই-বোনেরা, আমরা এই ভেবে আনন্দিত হতে পারি যে, আমরা একই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সন্তান, আমরা পরস্পরের ভাই-বোন। তাই আসুন, আমরা পরস্পরের জন্য, পরস্পরের সঙ্গে প্রার্থনা করি, সেবা করি যেন আমাদের হৃদয় মন্দিরে অনুরণিত হয় ভগবানের নাম, যেন হৃদয় মন্দির সাজাতে পারি ক্ষমা, সেবা, উদারতা ও ভালবাসার সদগুণগুলি দিয়ে।

পরমেশ্বরের দয়া সব মানুষের জন্য

দ্বিতীয় পাঠে রোমীয়দের কাছে পত্রে বিজাতীয়দের কাছে শ্রেষ্ঠ বাণীপ্রচারক সাধু পল আনন্দচিত্তে বলেন যে, তিনি বিজাতীয়দের কাছে প্রেরিতদূত এবং এ কাজে তিনি যেকোন ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত; কেননা বিজাতীয়রাও আহ্বান পেয়েছেন পরমেশ্বরের ভালবাসা, ক্ষমা ও পরিত্রাণ লাভের। মন পরিবর্তন, ঈশ্বরপুত্র যিশুকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে সকল জাতির মানুষই পেতে পারে ঈশ্বরের উদার দয়া ও ভালবাসার স্পর্শ।

প্রভু যিশু ও কানানীয় নারী

আজ মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে আমরা শুনেছি "এক কানানীয় নারীর গভীর বিশ্বাস ও প্রভু যিশুর দয়া"-র কাহিনী। মঙ্গলসমাচার রচয়িতা মথি তাঁর সুনিপুন লেখনিতে তুলে ধরেছেন ঈশ্বরপুত্র যিশু কিভাবে, কখন, একজন মায়ের কতটুকু বিশ্বাস দেখে সুস্থ করে তুলেছেন অপদূতে পাওয়া এক মেয়েকে। বিজাতীয় এই মেয়ে-কে সুস্থ করে তোলার ঘটনায় প্রভু যিশুর আশ্চর্য ক্ষমতা ও দয়া যেমন প্রকাশিত হয়েছে; তেমনি প্রকাশিত হয়েছে সকল জাতির মানুষের জন্য পিতা ঈশ্বরের উদার ভালবাসা।

কানানীয় নারীর প্রার্থনা

ঘরে অপদূতে পাওয়া অসুস্থ মেয়ে, অপদূত তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক কষ্ট দিচ্ছে। মেয়েটির মায়ের স্বীকারোক্তি, "আমার মেয়েটিকে একটা অপদূতে পেয়েছে; সে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে।" তাইতো অনিহুদী বা বিজাতীয় হয়েও সকল লজ্জা-ভয় ভেঙ্গে কানানীয় মা যিশুর কাছে প্রার্থনা করেছেন, "প্রভু, দাউদ-সন্তান, আমাকে দয়া করুন।" অনেক লোকের ভীড়ে তার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল না হয়তোবা, তখন সে চিৎকার করে বার-বার একই কথা বলতে থাকে- "প্রভু, দাউদ-সন্তান, আমাকে দয়া করুন।" এই মায়ের ধৈর্য ও প্রার্থনা আমাদের শিক্ষা দেয়-আমরাও যেন প্রার্থনায় ধৈর্যশীল হই এবং সবসময় প্রভু যিশুকে ডাকি, তাঁর কাছে অবিরাম প্রার্থনা করি পরস্পরের জন্য।

কানানীয় নারীর গভীর বিশ্বাস

প্রভু যিশুর কাছে দয়া, করুণা, সুস্থতা আশা করে, প্রার্থনা করে, ভিক্ষা করে কেউ কোনদিন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়নি। এই মঙ্গলসমাচারের কানানীয় মা-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে মেয়েটিকে সুস্থ করার পূর্বে প্রভু যিশু মেয়েটির মায়ের ধৈর্য ও বিশ্বাসের পরীক্ষা নেন এই বলে, "আমাকে শুধুমাত্র ইস্রায়েল বংশের হারানো মেষগুলির কাছেই পাঠানো হয়েছে।" এতেও ক্ষান্ত হয় না সেই মা। যিশুর সামনে প্রণত হয়ে মেয়েটির সুস্থতার জন্য মিনতি করতে থাকে-যা তার গভীর বিশ্বাসেরই প্রকাশ।

গভীর বিশ্বাসের প্রশংসা

বিজাতীয় নারীর এমন গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি দেখে প্রশংসা করে যিশু নিজেই বলেন- "মা, তোমার বিশ্বাস সত্যিই গভীর।" আমরা তো বিজাতীয় নই, আমরা যিশুর শিষ্য, যিশুর অনুসারী, তাই আসুন নিজেদের প্রশ্ন করি-

ক) আমরা কি অসুস্থতার সময়ে, জীবনের নানা সমস্যার মুহূর্তে যিশুকে খুঁজি? যিশুর চরণে কি প্রণত হই?

খ) আমরা কি জীবনের নানা জটিলতা ও সুখ-দুঃখ সবসময় বা প্রতিদিন ব্যক্তিগতভাবে বা পরিবারে একত্রে যিশুর কাছে প্রার্থনা করি?

গ) প্রভু যিশুর প্রতি আমাদের বিশ্বাস কতটুকু গভীর?

বিশ্বাসের পুরস্কার

আজকের মঙ্গলসমাচারের শেষ অংশে দেখি কানানীয় মা তার প্রার্থনা, ধৈর্য ও গভীর বিশ্বাসের পুরস্কার লাভ করেন।

মায়ের গভীর বিশ্বাসে মেয়ে হয়। কথায় আছে-"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু; তর্কে বহুদূর।" হ্যাঁ, খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, যিশুতে গভীর বিশ্বাস রেখে যদি আমরা পথ চলি, জীবন-যাপন করি তবে জীবন পথে যত অসুস্থতা, দুঃখ-বিপদ, জটিলতা-সমস্যাই আসুক না কেন তা জয় করতে আমরা শক্তি ও সাহস পাব প্রভু যিশুর কাছ থেকে। তিনিই আমাদের অভয়দাতা, মুক্তিদাতা, সুস্থতাদানকারী।

আমাদের জন্য নতুন শিক্ষা

আজকের মঙ্গলসমাচারের ঘটনাপ্রবাহে প্রভু যিশু আমাদের সামনে আধ্যাত্মিক জীবনের এক নতুন শিক্ষা তুলে ধরেছেন। বিজাতীয় নারীর প্রার্থনার ফল ও এই আশ্চর্য ঘটনার মধ্যদিয়ে প্রভু যিশু এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন। প্রাচীন যুগের মতো শুধু নিয়ম পালন নয়; বরং যিশুতে বিশ্বাস রেখে জীবন-যাপন আমাদের জীবনে বয়ে আনবে সুস্থতা, স্বচ্ছতা ও মঙ্গলময়তা।

প্রথমত আমরা জানি ও মানি যে, আমরা মানুষ হিসাবে কেউ শতকরা শতভাগ সফল ও সুস্থ নই। শারিরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিকভাবে বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে অথবা কোন না কোন ক্ষেত্রে সামান্যতম হলেও অসুস্থ। তাই কানানীয় নারীর মতো আমাদেরও প্রয়োজন যিশুকে খোঁজা, যিশুর কাছে আসা ও তার আশীর্বাদ যাচনা করা।

দ্বিতীয়ত আমাদের অসুস্থতা ও অপূর্ণতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে কোন না কোনভাবে আমাদের জীবনে প্রয়োজন আছে-অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা, এবং প্রয়োজন ঈশ্বর-এর দয়া, ভালবাসা ও ক্ষমা।

তৃতীয়ত আমরা সবাই সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে চাই; কিন্তু আমাদের সবারই কোন না কোন অভাব-অভিযোগ বা দুশ্চিন্তা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা কার কাছে যাব?

এইভাবে ভালবাসা, ক্ষমা, সেবা ও সুস্থতার এক অপূর্ব নিদর্শন দেখি উল্লিখিত ঘটনার মধ্যে।

স্বর্গরাজ্য কাদের জন্য?

আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, খ্রিস্টই আমাদের মুক্তিদাতা ও পরিত্রাতা। নিজ রক্তমূল্যে তিনি আমাদের পরিত্রাণ সাধন করেছেন। কিন্তু যারা খ্রিস্টকে চিনে না, জানে না অথবা এখনও বিশ্বাস করেনি এবং যারা মণ্ডলীর বাইরে তারাও কি পরিত্রাণ পাবে?

গল্প/ঘটনা : স্বর্গে একজন সাধু পিতরকে জিজ্ঞেস করল, "স্বর্গে কতজন হিন্দু আছে?" সাধু পিতর উত্তর দিলেন, "এখানে কোন হিন্দু নেই।" তারপর সে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কতজন মুসলিম আছে?" সাধু পিতর বললেন, "ও স্বর্গে একজনও মুসলিম নেই।" এবার আরও কৌতুহলী হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "ও বুঝেছি, তাহলে স্বর্গ শুধু খ্রিস্টানদের জন্যেই, তাই না?" সাধু পিতর বললেন, "না, স্বর্গ শুধু এককভাবে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টানদের জন্যেই না। ঈশ্বরের সন্তান যারা সৎ, সুন্দর ও পবিত্র জীবন-যাপন করে তারা সকলেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে।"

আজ মঙ্গলসমাচারের ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, "প্রভু যিশু শুধু খ্রিস্টান বা খ্রিস্টভক্তদের পরিত্রাণের জন্যেই"-আমরা যেন আমাদের এই সীমাবদ্ধ চিন্তার দেয়াল ভেঙ্গে উদারভাবে সকলকে ঈশ্বর-সন্তান হিসোবে ভাই-বোন বলে গ্রহণ করি এবং বিশ্বাস করি যে, প্রভু যিশু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পরিত্রাণের জন্যেই ক্রুশে জীবন দিয়েছিলেন। তাই যারা বিশ্বস্তভাবে, সততার সাথে ক্ষমা, ভালবাসা ও সেবায় জীবন-যাপন করবে, তারা সকলেই পিতার ঐশরাজ্য বা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে।

প্রেরণা : চিন্তা-চেতনা-হৃদয়ে গ্রহণ ও বহন

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আসুন আমরা একটু সময় ভেবে দেখি, কি জীবন-বাণী ও প্রেরণা নিয়ে আজ খ্রিস্টযাগের পর বাড়ি ফিরে যাব! অবশ্যই খ্রিস্টপ্রসাদে উপস্থিত প্রভু যিশুকে গ্রহণ করে, তাঁর ভালবাসা, তাঁর স্পর্শ হৃদয়ে নিয়েই বাড়ি ফিরবো। তবে এ সপ্তাহের জন্য এই অনুচিন্তন হৃদয়ে রাখতে পারি-

১। আমরা আপদে-বিপদে জীবনের যেকোন পরিস্থিতিতে সেই কানানীয় নারীর মতো যেন বার-বার প্রভু যিশুকে ডাকি- "প্রভু, দাউদ সন্তান যিশু, আমাকে দয়া কর।"

২। আমার জীবনে, আপনার জীবনেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারে যদি আমরা দৃঢ়ভাবে যিশুতে বিশ্বাস করি ও অবিরাম প্রার্থনা করি।

৩। আমরা যেন উদারভাবে মনে রাখি-পরিত্রাণ শুধুমাত্র খ্রিস্টানদের বা খ্রিস্টভক্তদের জন্য নয়; বরং ঈশ্বরের উদার ভালবাসা সকল জাতির সব মানুষের জন্য এবং ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমরা পরস্পরের ভাই-বোন।

জীবন-বাণী

খ্রিস্টেতে ভাই-বোনেরা, সেই বিজাতীয়/বিধর্মী স্ত্রীলোকের প্রার্থনা "প্রভু, দাউদ সন্তান যিশু, আমাকে দয়া কর।" আসুন এ প্রার্থনা আমরা গ্রহণ করি-আমাদের প্রতিদিনের জীবনে 'জীবন-বাণী' হিসাবে। সেই স্ত্রীলোকের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসা নিয়ে আসুন প্রভু যিশুকে ডাকি এবং এই কথাগুলি অনুধ্যান করি হৃদয়-গভীরে :

যখন তুমি একাকী, নিসঙ্গ তখন প্রার্থনা কর- "প্রভু, দাউদ সন্তান যিশু, আমাকে দয়া কর।"

প্রভু তুমিই হও আমার পথ চলার সঙ্গী ও বন্ধু।

যখন তুমি হতাশ-নিরাশ তখন প্রার্থনা কর- "প্রভু, দাউদ সন্তান যিশু, আমাকে দয়া কর।"

প্রভু তুমিই হও আমার বেঁচে থাকার নতুন আশা ও প্রেরণা।

যখন তুমি দুর্বল-অসুস্থ, তখন প্রার্থনা কর- "প্রভু, দাউদ সন্তান যিশু, আমাকে দয়া কর।"

প্রভু তুমিই তোমার ভালবাসার স্পর্শে আমাকে শারীরিক ও আত্মিভাবে সুস্থ করে তোল।

যখন তুমি কষ্ট পাও, যন্ত্রণায় কাতরাও, তখন প্রার্থনা কর-"প্রভু, দাউদ সন্তান যিশু, আমাকে দয়া কর।"

প্রভু তুমিই হও আমার শক্তি, শান্তি ও সান্ত্বনার উৎস।

যখন তুমি ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, তখন প্রার্থনা কর-"প্রভু, দাউদ সন্তান যিশু, আমাকে দয়া কর।"

প্রভু তুমিই হও আমার জীবনের খাদ্য ও পানীয়।

যখন অন্যেরা তোমাকে ঘৃণা করে, তখন প্রার্থনা কর-"প্রভু, দাউদ সন্তান যিশু, আমাকে দয়া কর।"

প্রভু তুমি তোমার ভালবাসায় আমায় ঘিরে রাখ।

যখন সবাই তোমার কাছ থেকে দূরে যায়, তখন প্রার্থনা কর-"প্রভু, দাউদ সন্তান যিশু, আমাকে দয়া কর।"

প্রভু তুমিই হও আমার চিরকালের বন্ধু।

যখন জীবনে আসে দুঃখ-বিপদ-ভয়, তখন প্রার্থনা কর-"প্রভু-দাউদ সন্তান যিশু, আমাকে দয়া কর।"

প্রভু তুমিই হও আমার পথের আলো।

হে প্রভু, হে দাউদ সন্তান যিশু, তুমি আমাদের দয়ালু-দরদী প্রভু/তুমি কোমলপ্রাণ, বিনীত হৃদয়/আমাদের তুমি দয়া কর, সুস্থ রাখ, তোমার স্পর্শ দাও/সকল প্রকার আত্মিক ও শারীরিক অসুস্থতা দূর কর/যেন দেহ-মন-আত্মায় সুস্থ থেকে/আমরা তোমার জয়গান-গুণগান করতে পারি। - আমেন ॥

খ্রিস্টবিশ্বাস পরিপক্কতার যুতসই পালকীয় পদক্ষেপ

ফাদার যোসেফ মুরমু

কথিত আছে, গ্রাম্য খ্রিস্টভক্তদের, খ্রিস্টবিশ্বাস অপরিপক্ক। কথায়-কথায় বলা হয়, গ্রাম্য খ্রিস্টভক্তরা ধর্ম-বিধিবিধান চর্চা করে না বলে, তাদের খ্রিস্টানসমাজ নড়বড়ে। কথাগুলো খুব সত্য না হলেও, মন্তব্যের বাস্তবতা নজর কাড়ে। মন্তব্যের একটি দিক, তা হলো, পরিচ্ছন্নভাবে নতুন প্রজন্ম সমাজ ধর্মজ্ঞানশুন্য। প্রজন্ম বলতে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং যুব সমাজ। এরাই খ্রিস্টবিশ্বাসের পরিপক্কতার ভিত্তি। এই অপরিপক্কতার ভিত্তি শক্ত করার কিছু দৃশ্যমান দল ও উপায় হলো, যেমন - গ্রাম্য গির্জার জন্য দক্ষ প্রার্থনা পরিচালক, গ্রাম্য শিশুমঙ্গল, মারীয়া সেনা সংঘ (যদি থাকে), গির্জা পরিচালনা কমিটি, গ্রাম্য সমাজ কমিটি এবং পালকীয় কাজে ধর্মশিক্ষাদানের পদ্ধতি-কর্মসূচি, ইত্যাদি। এই দল ও উপায়গুলো অবলম্বন করে, গ্রামের বয়স্ক নর-নারী ও শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং যুব সমাজকে পরিপক্ক খ্রিস্টবিশ্বাসে গড়ে তোলা সম্ভব। তবে সংশ্লিষ্ট দলের ব্যক্তিরা খ্রিস্টবিশ্বাস গঠনে দায়িত্ব-ভার নিলে ও উপায় যথাযথ কার্যকরী করলে, গ্রাম্য খ্রিস্টভক্তরা খ্রিস্টবিশ্বাসে পরিপক্কতায় বেড়ে উঠবে। গ্রাম্য খ্রিস্টভক্তের মধ্যে পরিপক্কতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

খ্রিস্টান সমাজে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবদের শহর ও গ্রাম্য বাড়িতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না বলা যায়, তেমনি ধর্মপল্লী থেকেও শিক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ধর্মশিক্ষা দেওয়ার যেটুকু চেষ্টা হচ্ছে, তাতেও অভিভাবকদের উৎসাহ মেলে না। অসহযোগিতার কারণে শিশু-কিশোর-কিশোরী ও যুবরা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের পরিচয় ও ধর্মশিক্ষা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, বঞ্চিতও করা হচ্ছে। খেয়াল করুন, গ্রাম্য সমাজ-পরিবারে বহু পিতা-মাতা আছেন, যারা ঠিকমত ক্রুশ চিহ্ন করে না, কোন রকম মাণ্ডলীক প্রার্থনাগুলো বলা শেষ করেই "আমেন" দিয়ে সমাপ্তি টানেন। আবার উপাসনা দিবসে গির্জায় শিশু, কিশোর-কিশোরীরা অনুপস্থিত, পিতা আছে তো মাতা নেই, আর যুবরা তো শরতের পশ্চিম আকাশের মেঘের মত ছিটেফোটা কয়জন। এ অবস্থার যৌক্তিক কারণ হ'ল ধর্মশিক্ষার চরম অভাব, মাঝে-মধ্যে এ অবস্থা দেখে কেন যে মনে হয় যে, পিতা-মাতা ও ধর্মপল্লীর অভিভাবকেরা ভেবে রেখেছেন যে, শিশু-কিশোর-কিশোরী ও যুবরা ধর্মবিষয়ক সবকিছু প্রাপ্ত হলে স্বয়ংক্রীয়ভাবে শিখে ফেলবে। উদারহরণস্বরূপ, এমন কোন আশ্চর্য কাজ কুশ্মিনকালেও ঘটবে না। সুতরাং যুক্তি উত্তর হ'ল, ধর্মশিক্ষার সরল সমাধানের অবলম্বন হবে পুরোহিত/পুরোহিতগণ এবং তাদের যোগ্য সহকর্মী ধর্মশিক্ষক এবং ক্যাটেখিজম কর্মসূচি উপযুক্ত শিক্ষার ধারা-পন্থা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া।

শিশু-কিশোর-কিশোরী ও যুবদের খ্রিস্টবিশ্বাস পক্ক করার উপযুক্ত দিন শুক্রবার, সরকারী ছুটির দিন। আরো অন্যতম উপায় রয়েছে, তা হ'ল মণ্ডলীর-'আগমন ও তপস্যাকাল'। এ কালচক্রে গ্রাম্য শিশু-কিশোর-কিশোরী ও যুবদের জন্য বাইবেল অনুধ্যান ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের আয়োজন করে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যায়। এর সঙ্গে সাপোর্ট প্রোগ্রাম হিসেবে মাসের একটি শুক্রবার তাদের জন্য খ্রিস্টযাগ আয়োজন করে, ঐদিন উৎসর্গের পরে ধর্মশিক্ষক, সিস্টার ও পুরোহিত ধর্মশিক্ষা দিতে পারেন। এতে শিশু-কিশোর-কিশোরী ও যুবদের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ বাড়বে, খ্রিস্টযাগের ধারণা স্পষ্ট হবে এবং ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি পাবে। মনে করি এভাবে মাণ্ডলীক ধর্মশিক্ষা কর্মসূচি নিয়মিত পরিচালনা করার উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে গেলে তাদের খ্রিস্টবিশ্বাসে পরিপক্কতা আসবে এবং ভাল খ্রিস্টান হবে। তবে মণ্ডলীর এ কর্মসূচিতে খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণ এবং বাস্তবায়নে দায়িত্ব নিতে প্রত্যাশা করে।

শুধু ঐ দলের জন্য ধর্মশিক্ষার কর্মপন্থার কার্যকরি করা যথেষ্ট নয়, বয়স্কদেরও কর্মপন্থার আওতায় আনা সমীচীন, কেননা, বয়স্করা বরাবরই ধর্মশিক্ষা নেয়া থেকে বঞ্চিত হলে, তাদের সন্তানেরা ধর্মশিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাসে অপরিপক্ক থেকে যাবে। এখন এ অবস্থার নিরসনের একটি মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন; গ্রামের যে গির্জা সাধু-সাধ্বীর নামে, নামকরণ করা হয়েছে, ঐ নামের পর্ব পালনের পরিকল্পনা নিলে ভাল হয়। তা হলে, এ উপলক্ষে সেখানে পর্বের আগের দু/তিনদিনের নভেনা প্রার্থনা আয়োজন করা যায়, ও সময়ই ওখানে ধর্মের বহু বিষয়ে, যেমন- বাইবেল, ধর্মসঙ্গীত, পারিবারিক, স্কুল পাঠ্যক্রম, নৈতিকতা ও বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে। এ রকম কর্মপন্থা সফলের জন্যে 'ক্যাটেখিস্ট ও সিস্টার' গ্রামে গিয়ে থাকবেন, পুরোহিতও উপস্থিত থাকবেন। ঐ কয়দিন খ্রিস্টভক্তদের প্রয়োজনে এভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা নিলে খ্রিস্টভক্তদের খ্রিস্টবিশ্বাস অনেকাংশে পরিপক্ক করা সম্ভব। আরো কোন পদ্ধতি থাকলে, প্রয়োগ করা উচিত এবং সক্রিয় রাখা ন্যায়সঙ্গত হবে।

গ্রামে-গঞ্জে শিশু-কিশোর-যুব ও বয়স্কদের মধ্যে ধর্মশিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের বেলায় কিছু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, যেমন, এই দায়িত্ব কে নেবে! এর জবাবে এভাবে বলা যাবে যে, গির্জা পরিচালনা কমিটি ও গ্রাম্য সমাজ কমিটির সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সহযোগিতায় পাল-পুরোহিত স্বীয় গ্রামের গির্জা মাস্টার, কলেজ পড়ুয়া কোন উৎসাহী যুবক-যুবতী, শিক্ষিত কোন মহিলা-পুরুষকে দায়িত্ব দেবেন এবং তাদের সঙ্গে তিনি সিস্টার ও সার্বক্ষণিক ধর্মশিক্ষাকে যুক্ত করবেন, আর হাতে শিক্ষার উপকরণ ব্যবস্থা করিয়ে দেবেন। পাল-পুরোহিত নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থার চেক-আপ করবেন এবং ধর্মশিক্ষকদের উৎসাহ দিবেন, যুগোপযোগী বিষয়বস্তু নির্ধারণ করিয়ে দিয়ে ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রটি কার্যমুখি করবেন, যাতে কর্মীরা ভাল ক্লাশ দিতে পারেন। তাহলেই শিশু-কিশোর-কিশোরী-যুবরা এবং বয়স্করা পরিপক্ক খ্রিস্টবিশ্বাসী হয়েছে বলে দাবি করা যাবে। তবে পাল-পুরোহিতকে পরিপক্ক খ্রিস্টবিশ্বাসীভক্ত গড়ে তোলার জন্য সর্বদা হাল ধরে এগিয়ে চলবেন, তিনি সেদিকে সক্রিয় দৃষ্টি রাখবেন, এবং বরাবর কর্মসূচিতে যুক্ত থাকবেন।

অতএব, গ্রাম্য খ্রিস্টভক্ত ও বর্তমান প্রজন্মদের খ্রিস্টবিশ্বাসে অপরিপক্কতার দুর্নাম ঘুচিয়ে দেয়ার উপযুক্ত কর্মপন্থা স্থানীয় মণ্ডলীর কর্ণধারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রণয়ন করে যোগ্য ব্যক্তিদের যুক্ত করে চালিয়ে নিতে হবে। এ প্রচেষ্টায় তথাকথিত বিশ্বাসের অপরিপক্কতার দুর্নাম ঘুচিয়ে দেওয়া সম্ভব। উপরন্ত ইতিপূর্বে যে দিকগুলোর (সামাজিক ও মাণ্ডলীক কাঠামোর অর্ন্তভুক্ত) গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা গেলে গ্রাম্য খ্রিস্টভক্তদের বিশ্বাসে পরিপক্কতা ফিরে আসবে। তবে গোটা বিষয়টির সুরাহা দেওয়া সহজ না বলে মণ্ডলী ও সংগঠকগণ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে এবং সদস্যরা যথেষ্ট পরিশ্রম, ত্যাগস্বীকারে মনোযোগি হলে, খ্রিস্টভক্তদের তথা ঐ উল্লেখিত দলের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের পরিপক্কতা আসবেই। এরপরেও কথা থাকে যে, দলের সদস্য-সদস্যাদের আপ-টু-ডেট করার লক্ষ্যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রশিক্ষণ দিতে হবে, প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক সরবরাহ করিয়ে দিতে হবে। এসবের মাধ্যমেই খ্রিস্টভক্ত এবং বর্তমান প্রজন্মদের মধ্যে খ্রিস্টবিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাস দিন-দিন বৃদ্ধি হবে। একদিন গ্রাম্য সমাজের সকলেই পরিপক্ক খ্রিস্টবিশ্বাসী বলে পরিচয় দিতে পারবে। ধর্মে পরিপক্কতার ব্যাপারে আর কারোর বাড়তি কথা শুনতে হবে না তাদের॥ ❑

গৃহমণ্ডলী: আমরা দীক্ষিত-আমরা প্রেরিত

ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা

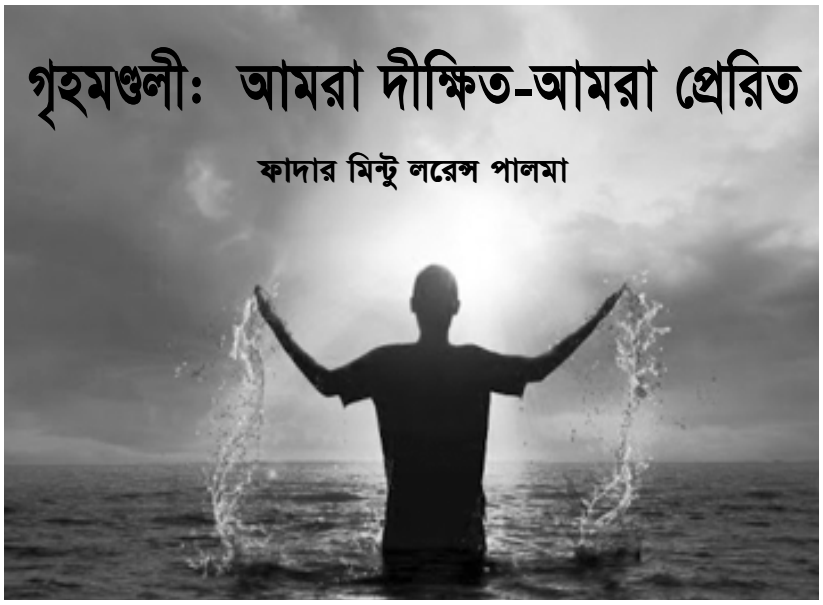

তিনটা শব্দেরই যথেষ্ট ওজন আছে, মাহাত্ব আছে, মর্যাদা আছে। খ্রিস্টস্থাপিত মণ্ডলীতে এগুলো অবিচ্ছিন্ন ও ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মণ্ডলী ও ভক্তমণ্ডলীর জীবনে এগুলোর অর্থ, অর্জন ও ধারণ অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য। খ্রিস্টান হিসাবে বিশ্বাসের জীবনে তার মণ্ডলী, তার দীক্ষা, তার শিক্ষা, তার সাক্ষ্য এগুলোর প্রতিশ্রুতি দৃঢ়তার সাথে পালনেই ব্যক্তির যথার্থ পরিচয়। একজন খ্রিস্টানের আনন্দ, গর্ব ও গৌরব মণ্ডলীর ভক্ত হিসাবে ভুক্ত হওয়ার মধ্যেই নয় বরং তার দীক্ষামন্ত্রে যুক্ত থাকা, খ্রিস্টের শিক্ষায় সুশিক্ষিত হওয়া ও তার জগত জীবনে এর সাক্ষ্যে সক্রিয় থাকা।

আমরা ছোটবেলায় দীক্ষা পেয়েছি, দীক্ষা নেইনি। আমাকে দীক্ষা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি কি বড় হয়ে সচেতনভাবে সেই দীক্ষাটাকে আমার করে নিয়েছি কিনা? যদি তা আমার করে নেই তখনই আমার ভিত্তিটা শক্ত হয়, আমার পরিচয়টা পোক্ত হয় আর আমার প্রেরণটা প্রেরণার ও প্রত্যয়ের হয়। আসলে শুরুটা শক্ত হলে, গৃহটা সুগঠিত হলে, বীজতলাটা বিশুদ্ধ বিদ্যালয় হলে আমাদের দীক্ষামন্ত্র দৃঢ়তা পাবে, আমাদের শিক্ষা সমৃদ্ধ হবে এবং আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসের সাক্ষ্যপ্রেরণ সফল-স্বার্থক হবে। বাংলাদেশ খ্রিস্টীয় স্থানীয় মণ্ডলীর প্রেক্ষাপট অন্যরকম। শতে একজনেরও কম খ্রিস্টান। 'আমরা দীক্ষিত-আমরা প্রেরিত' এই বিষয়টা এই প্রেক্ষাপটে নিরানব্বইজনের মধ্যে 'প্রেরিত' খ্রিস্টান হিসাবে আমাদের সাক্ষ্যদানে কিন্তু আরো অর্থপূর্ণ ও নিশ্চিতভাবে আলোকিত ও আলোড়িত অবস্থান রয়েছে।

ক) গৃহমণ্ডলী

মণ্ডলী: মণ্ডলী হলো খ্রিস্টস্থাপিত এ জগতে দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠান যা স্বাধীন, স্বনির্ভর ও স্বশাসিত সমাজ। এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো যে খ্রিস্ট হলো মণ্ডলীর মস্তক, পবিত্র আত্মা হলো মণ্ডলীর পরিচালনাকারী, এর মৌলিক নিয়ম হলো ভালোবাসা এবং এর উদ্দেশ্য হলো স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও মানব আত্মার পরিত্রাণ। দীক্ষাস্নানে বিশ্বাসীগণ মণ্ডলীর সদস্য হয়ে এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজ গৃহ থেকেই, পরিবার থেকেই শুরু করেন খ্রিস্টীয় ভালোবাসা ও মানব পরিত্রাণের এই প্রৈরিতিক যাত্রা।

আর প্রতিটি গৃহে দীক্ষিত পরিজনদের মধ্যে মঙ্গলসমাচারের আলোকে জীবনই গৃহমণ্ডলী। যেখানে থাকবে খ্রিস্টীয় ভালোবাসার নান্দনিক আবাস, সবার মধ্যে দীক্ষামন্ত্রের প্রতিশ্রুতি পালনে আন্তরিক প্রয়াস ও পারিবারিক খ্রিস্টীয় রীতি-নীতিবোধ, বিশ্বাস-ভক্তি ও খ্রিস্টীয় শিক্ষা-সাক্ষ্যদানের প্রৈরিতিক প্রকাশ।

খ) দীক্ষাস্নান ও দীক্ষিতজন

খ্রিস্টীয় জীবনটা সাক্রামেন্তীয় জীবনও। দীক্ষাস্নান খ্রিস্টীয় জীবনের প্রবেশ পথ। "দীক্ষাস্নান হলো খ্রিস্টীয় জীবনের ভিত্তি, পরম আত্মায় জীবন-যাপনের প্রবেশদ্বার এবং অন্য সংস্কারগুলোর দিকে গমনপথ" *(কা. ম. ধ. ১২১৩)*। দীক্ষাস্নানেই খ্রিস্টের অনুসারী হই, মণ্ডলীর সদস্য হই, ঈশ্বরের সন্তান হই ও নবজন্ম লাভ করি। দীক্ষাস্নানের সময় বলা হয় 'মণ্ডলী একটি বড় পরিবারের মত। আজ ঈশ্বরের সেই বড় পরিবারে এ শিশুকে আমরা গ্রহণ করছি। আজ ঈশ্বরও এ শিশুকে গ্রহণ করছেন নিজ সন্তান রূপে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে। এ শিশুর জন্য আজ নবজন্মের দিন। পিতামাতা হিসাবে, ধর্মপিতা-মাতা হিসাবে, খ্রিস্টীয় সমাজ হিসাবে এক আনন্দের দিন ও এ শিশুর প্রতি আমাদের যে গুরুদায়িত্ব রয়েছে তা গ্রহণ করার দিন"। দীক্ষাস্নানের সময় সন্তানের জন্য পিতা-মাতা ও ধর্মপিতা-মাতাগণ বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। মণ্ডলীর কাছ থেকে তারা সন্তানের জন্য দীক্ষাস্নান প্রার্থনা করেন। তাকে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে ও খ্রিস্টীয় প্রেমের আদর্শে মানুষ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শয়তানকে, শয়তানের সমস্ত কাজকে, শয়তানের সমস্ত প্রলোভনকে পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করেন। আর সন্তানের হয়ে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র স্বীকার করেন। শেষে এই কথাগুলো উচ্চারণ করা হয়" এ হলো আমাদের বিশ্বাস, এ হলো মণ্ডলীর বিশ্বাস এ বিশ্বাস স্বীকারেই আমাদের পরম গৌরব"।

দীক্ষাস্নানে সে পাপ থেকে নবজন্ম লাভ করেন, পরিত্রাণদায়ী তৈলে অভিষিক্ত হন, খ্রিস্টবিশ্বাসীর মর্যাদা ও গৌরবে ভূষিত হন এবং খ্রিস্টের জীবনদায়ী আলোর সন্তান হয়ে ওঠেন, মহাযাজক ও পরমগুরু খ্রিস্টের শিষ্য হন, খ্রিস্টের রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক ভূমিকা গ্রহণ করেন। এর সাথে সম্পৃক্ত সাক্রামেন্ত অর্থাৎ হস্তার্পণের (দৃঢ়ীকরণ) মধ্য দিয়ে এই দীক্ষিতজন খ্রিস্টের সেনা ও সাক্ষী হন। এ-নিয়ে সে একজন খ্রিস্টান। গর্বিত হওয়ার মত একজন খ্রিস্টান। এগুলোর অধিকারী, বহনকারী ও পরিচয়দানকারী দীক্ষিতজনকে প্রণাম জানাতেই হয়। তবে মনে রাখতে হয় এগুলো জীবনের প্রতিটি অবস্থায় ও বাস্তবতায়, চেতনায় ও জীবনসাক্ষ্যে কার্যকরী চর্চার মধ্যেই প্রেরিতের প্রকৃত পরিচয়।

গ) জীবন বাস্তবতায়-বিশ্বাসের চর্চা

১) পারিবারিক বিশ্বাসের চর্চায়

আমরা পারিবারিকভাবে খ্রিস্টান, কারণ জন্মের পর পিতা-মাতার প্রথম কাজ হলো সন্তানকে দীক্ষিত করা। প্রতিশ্রুতি ছাড়া দীক্ষা হয় না। এই প্রতিশ্রুতি অবুঝ শিশুর নামে পিতা-মাতাগণ ও ধর্মপিতা-মাতাগণ গ্রহণ করেন এবং সন্তানদের মধ্যে তা রোপন করেন। এটা একটা বড় দায়িত্ব। এখানে তারা প্রথম প্রেরিত। পিতা-মাতা ও ধর্মপিতামাতাদের এটা তাদের আদর্শিক দায়িত্ব, বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতির দায়িত্ব, মণ্ডলীর বিধি নির্দেশিত দায়িত্ব। শিশুকাল থেকে তারা যদি খ্রিস্টীয় শিক্ষার মৌলিক আদর্শ ও বিশ্বাসের তত্ত্ব ও সত্যগুলো তাদের

কাছ থেকে পায় তাহলে বড় হয়ে বিশ্বাসের চ্যালেঞ্জ আসলেও তারা তা রক্ষা করার চেতনা হারাবে না। যেহেতু আমরা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে শতে একজন খ্রিস্টান তাই এই বাস্তবতায় আমাদের সন্তানদের দীক্ষা ও শিশু অবস্থায় থেকেই তার শিক্ষা ও পারিবারিক বিশ্বাসের চর্চায় বড় হয়ে বৃহত্তর অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তার সাক্ষ্যদানে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবে।

২) ক্ষুদ্র সমাজ ব্যবস্থায়

দীক্ষা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক হলেও তার চর্চা কিন্তু পারস্পরিক ও সামাজিক। কারণ আমরা খ্রিস্টান হিসাবে মণ্ডলীর পরিচয়ে পরিচিত। মণ্ডলীর পরিচয়ে অমরা ঐশজনগণ অর্থাৎ একটা খ্রিস্টীয় ভক্তমণ্ডলী। তাই সারাদেশে বৃহত্তর সমাজে বিভিন্ন জায়গায় জেলা শহরে-প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছোট ছোট খ্রিস্টান গ্রাম-সমাজ হিসাবে যুগ-যুগ ধরে বসবাস করে ছড়িয়ে থেকে আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের মন্ত্র একতা, মিলন ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিদিনের চর্চায়, প্রতিদিনের সাক্ষ্যে তুলে ধরাই দীক্ষামন্ত্রের সার্থকতা।

৩) বিদ্যালয়ে

মণ্ডলীর প্রচার, পরিচয় ও বিস্তারের ক্ষেত্রে শিক্ষাসেবার মাধ্যমটা মণ্ডলীর গোড়া থেকেই চলে আসছে। আমাদের প্রেক্ষাপটে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীরা অন্য ধর্মের। সেখানে মণ্ডলীর এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নামই খ্রিস্টান পরিচয়ের সাক্ষ্য দেয়। এর সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জড়িত খ্রিস্টান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ও খ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খ্রিস্টাদর্শের সাক্ষ্য যেন সর্বদা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায় সেদিকে বর্তমানে অনেক সচেতন থাকতে হবে। আর খ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রীদের দীক্ষিত দায়িত্বই রয়েছে তাদের কথাবার্তায়, চাল-চলনে, ব্যবহারে অবশ্যই খ্রিস্টাদর্শ সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া। সর্বোপরি, আমাদের খ্রিস্টান ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনায়ও এগিয়ে থাকার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে যেন আমাদের খ্রিস্টান পরিচয়ের গৌরব ও বিশ্বাসের সৌরভ (আলো ও নুনের মতই) অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে।

৪) অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও শিক্ষা জীবনে

খ্রিস্টান হিসাবে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের এই সময়টা ও জীবনটা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় ও সাক্ষ্যদানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাজারো ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র কয়েকজন খ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রী যারা দুই বছর, চার বছর, ছয় বছর ধরে পড়াশুনার সময় কাটায়। এসময়টা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে পরিচয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। খ্রিস্টবিশ্বাসের আদর্শপূর্ণ "খ্রিস্টান" পরিচয়টা নিয়ে প্রতিষ্ঠানে ও অন্যদের সাথে পদচারণায় ও আদর্শ ছাত্রত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে শিক্ষা জীবন-যাপন করাও কিন্তু খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণকর্ম।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠিতে একজন খ্রিস্টান কিন্তু অনেকের আড়ালে থাকে না। প্রথমত তাদের প্রতি বিশেষ করে আমাদের মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি ও আগ্রহ অনেক বেশি। এতে করে সময় সময় পরিচয় থেকে প্রেম-পরিণয় পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারা যেন সেই দীক্ষার মন্ত্র কখনো ভুলে না যায়। জীবনে যাই ঘটুক বা সম্পর্কে জড়ানোর মত যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক তবে তা যেন বিশ্বাস ও খ্রিস্টাদর্শ বিসর্জন দিয়ে নয়।

৫) কর্মক্ষেত্রে

এটা আরো একটা অতীব বাস্তব ক্ষেত্র যেখানে হয়তোবা একমাত্র খ্রিস্টান হিসাবে বা অল্পসংখ্যক হিসাবে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ও বড় জনগোষ্ঠির মাঝে কর্মরত। সবার নজরটা বা আগ্রহটা কিন্তু থাকে সেই খ্রিস্টানের দিকে। সেখানে তার আদর্শ, তার বিশ্বাস, তার মূল্যবোধ অন্যদের কাছে বড় একটা দৃষ্টান্ত হতে পারে। তাছাড়া এটা বাস্তব যে খ্রিস্টানের প্রতি তাদের আগ্রহ ও ধর্ম নিয়ে কথা বলার আগ্রহ দেখিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বরং খ্রিস্টভক্তের তর্কে না গিয়ে তার সদাচরণ, সততা, কাজের প্রতি বিশ্বস্ততাই অন্যদের সামনে খ্রিস্টবিশ্বাসীর সাক্ষ্য ফুটে উঠবে।

ঘ) দীক্ষিতজনের বিশ্বাসের চর্চায় ক্ষতের দিক

১) ব্যক্তিগত চর্চা নেই:

আমরা দীক্ষা নিয়েছি কিন্তু বড় প্রশ্ন আমার ব্যক্তিগত চর্চায় কি তা যথাযথ প্রকাশ করছি কিনা? অনেক সময়ই দেখা যায় এক্ষেত্রে অবেহেলা আছে। বিশেষ করে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে যাদের পদচারণা বেশি তারা কি তাদের কথায়-কাজে, আচার-আচরণে-ব্যবহারে খ্রিস্টানের অনন্য পরিচয়ের আদর্শ ধরে রাখতে পারছে কিনা? তাদের কাছে পৌছাতে পারছে কিনা? এই প্রশ্নটা তাদের মধ্যে দিতে পারছি কিনা যে আমাদের বিশ্বাস অনেক শক্ত, অনেক দৃঢ়, অনেক সৎ। অনেক খ্রিস্টান কিন্তু এখানে ব্যর্থ। এ সময়ে তাদের আত্মমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে নিজ বিশ্বাসের মূলমন্ত্রকে নবায়নের অতীব দরকার রয়েছে।

২) পারিবারিক চর্চা নেই:

এমনকি অনেক পরিবার আছে যারা গোটা পরিবারই দীক্ষিত খ্রিস্টান হিসাবে বিশ্বাসের চর্চা করে না। শুধু বড়দিন আর ইস্টার ছাড়া সারা বছরে যাদের আর দেখা যায় না। আমার জানা মতে একটা বড় সংখ্যা যারা এ মধ্যে পরে। ঢাকা শহরে তো আছেই তাছাড়া গ্রামের ধর্মপল্লীগুলোতেও দেখা যাবে বেশ কিছু পরিবার পারিবারিকভাবেই বিশ্বাসের চর্চার অবহেলা শুধু নয় অপচর্চা করে থাকে। এসময়ে তাদের খুঁজে বের করতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে বেশ অনেক পরিবার আছে যাদের তুক-তাক ও ফকিরীবাদের ওপর অনেক বেশি বিশ্বাস রাখে খ্রিস্টবিশ্বাসের চেয়ে।

৩) নিজের দীক্ষা ভুলে যাওয়া:

দীক্ষা নিয়েছে বা তাদের দীক্ষা দেওয়া হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে তারা নিজেরা ভুলে গেছে। আর্থিক অবস্থার কারণে বাবা-মায়েরা ছেলে-মেয়েদের অন্য মণ্ডলীর পরিচালিত বিভিন্ন হোস্টেলে দিয়ে থাকে এমনকি বিভিন্ন অখ্রিস্টান আবাসিক হোস্টেলে রেখে পড়িয়ে থাকে এদের অবস্থা কি? জিজ্ঞেস করলে সাধারণ ক্রুশের চিহ্নটাও করতে পারে না কাথলিক বিশ্বাসের জ্ঞানের ব্যাপারে অন্য কিছুতো দূরের কথা। এ সময়ে এদের খুঁজে বের করতে হবে।

৪) বিশ্বায়ন প্রভাবে বিচ্ছিন্ন জীবন

বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রভাবে বেশ অনেক ব্যক্তি ও পরিবার আছে যারা জীবন নির্বাহের কারণে ধর্মপল্লীর পরিমণ্ডলের বাইরে দুর-দুরান্তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে বসবাস করে যাচ্ছে। অনেকের বাড়িতে জায়গা-জমি নেই তাই এটাই যাদের বাস্তবতা। তাছাড়া অসামাজিক কাজের জন্যও অনেক ব্যক্তি ও পরিবার নিজেদের খ্রিস্টান সামাজিক স্পর্শ থেকে শহরের কানাচে লুকিয়ে রাখছে। এর একটা বড় সংখ্যা কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমান। তারাতো খ্রিস্টান হিসাবে দীক্ষিত। তাদের খুঁজে বের করে ঐ রোপিত বাস্তবতায় প্রেরিত থাকার প্রেরণা দিতে হবে।

ঙ) মিশ্র বিশ্বাসের মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে প্রেরিত সাক্ষ্য

আমাদের প্রেক্ষাপটে একটা বড় সংখ্যা অন্য মণ্ডলীর সাথে ও অন্য ধর্মবিশ্বাসীর সাথে ক্যাথলিক মণ্ডলীর নিয়ম অনুসারে মিশ্রবিবাহে প্রবেশ করছে। এখানে কাথলিক পক্ষ বিশেষ শর্ত ও বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে এইরকম বিবাহিত জীবন বা পারিবারিক জীবনে যাচ্ছে। এখানে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে প্রতিদিনের জীবনে যেন তার খ্রিস্টবিশ্বাসের চর্চা অক্ষুন্ন রাখেন এবং তাদের সন্তানদের খ্রিস্টবিশ্বাসে দীক্ষা দেন। আমাদের বাস্তবতায় এরকম মিশ্র-সম্পর্ক

থামানো যাবে না তবে পারিবারিকভাবে সন্তানদের খ্রিস্টবিশ্বাসে এমনভাবে দৃঢ় করে তোলা যাতে পরবর্তীতে এমন পরিস্থিতি হলে যেন অন্য বিশ্বাসীর সাথে পারিবারিক জীবনে খ্রিস্টবিশ্বাসে দৃঢ় থাকেন ও এর সাক্ষ্য অন্যদের কাছে দিতে পারেন। আমার জানা নেই যেসব ধর্মপল্লীগুলোতে বেশি সংখ্যক মিশ্রবিবাহ হয় সেইসব ধর্মপল্লীতে তাদের জন্য পালকীয় যত্নের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা। বিবাহের পর তাদের কোন খোঁজই থাকে না কে কিভাবে আছে, কোথায় আছে। এটা সত্য যে, এই মিশ্রবিবাহের জীবনটা তুলনামূলকভাবে অনেক চ্যালেঞ্জের যেটা পারিবারিক ক্ষেত্রে ও বিশ্বাস চর্চার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে যারা বিবাহ হয়ে খ্রিস্টান পরিবেশ থেকে দূরে অন্য পরিবেশে ও অন্য বিশ্বাসী পরিবারে থাকে তাদের অনেক দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হয় এবং বিশ্বাসের পরীক্ষা দিতে হয়। দৃঢ় ও গভীর কাথলিক খ্রিস্টবিশ্বাসী কখনো তার বিশ্বাস নিয়ে আপোষ করবে না। সেই পরিবারে থেকে কিভাবে সে প্রেরিত Agent হতে পারে তার প্রেরণা দেওয়া।

চ) খ্রিস্ট ধর্মত্যাগীজনের প্রেরণ বাস্তবতা

আমাদের এই প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টা খুব একটা আলোচনায় আনি না আর তা হলো আমাদের সারা বাংলাদেশে খ্রিস্টান পরিবার থেকে কতজন খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করেছেন। বিগত পঞ্চাশ বছরের হিসাবে কত হতে পারে? কয়েকশত না কয়েক হাজার? আমি বলবো কয়েক হাজার। আশ্চর্য হয়েছেন? এটাই সত্য। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে দিনে-দিনে ধীরে-ধীরে খ্রিস্টবিশ্বাসের চর্চা না থাকায় ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে খ্রিস্টধর্ম অনেকটা ত্যাগ করেছেন। তবে কিছু-কিছু অবশ্য খ্রিস্টবিশ্বাস টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে থাকে। এই যে প্রতি বছর এভাবে যারা চলে যাচ্ছে ও যারা হিসাবের বাইরে থেকে এক পর্যায়ে খ্রিস্টানসমাজের সংস্পর্শহীন ও বিশ্বাস চর্চাহীন জীবনে আছে তারা যে পরিবেশে-প্রতিবেশে-পরিবারে রয়েছে তাদের দীক্ষার মূলমন্ত্র কি একেবারে বির্সজন দিয়েছে কিনা তার একটা স্টাডি দরকার। বর্তমানে লক্ষ্য করা যায়, আমাদের খ্রিস্টান ছেলে-মেয়েরা প্রেমে আবেগ আপ্লুত হয়ে নিজের ধর্ম ত্যাগ করতেও দ্বিধা করে না। তারা অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে Affidavit করে নাম পরিবর্তন করে মুসলমান নাম নিয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে নিকা করে। তা করে অনেক সময় নিজে ইচ্ছা করে আবার অনেকে বিশ্বাস নিয়ে নিজের Signature দিয়ে দেয় আর তা নিয়ে অপরপক্ষ নাম পরিবর্তন করে নিকার কাগজ তৈরি করে নেয়। তারা কি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস ত্যাগ করেছে? এগুলো মূল্যায়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। তারা দীক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে এরকম বাস্তবতায় কিভাবে প্রেরিত হতে পারে সে ক্ষেত্রে মণ্ডলী কোন ভূমিকা রাখতে পারে কিনা তা ভাবতে হবে যেন তারা একেবারে হারিয়ে না যায়। সেই পারিবারিক বাস্তবতায় কোনভাবে তার কাছ থেকে গৃহমণ্ডলীর স্ফুলিঙ্গ অন্যেরা যেন পেতে পারে সেই ক্ষেত্রে প্রত্যয়ী থাকা।

ছ) অখ্রিস্টান জনপদে আমি একজন দীক্ষিত খ্রিস্টান

সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশে আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ধন্য কারণ নিরানব্বইজন অখ্রিস্টান জনপদে আমি একজন দীক্ষিত খ্রিস্টান। নব্বইজন খ্রিস্টানের মধ্যে আমার উপস্থিতি ও সাক্ষ্যের চেয়ে এই নিরানব্বইজন অখ্রিস্টানের মধ্যে আমার উপস্থিতি, আমার পদচারণা, আমার অবস্থান আরো বেশি সার্থকতার, কারণ বিশাল এই প্রেরণক্ষেত্রে বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে। যিশুর কথামত 'তোমরা সমস্ত জগতে যাও'...তোমরা জগতের আলো'....তোমরা জগতের লবণ'...এই কথাগুলো আমাদের মত দেশের বাস্তবতায় প্রেরিত হওয়ার ক্ষেত্রে এই মাটিতে আমাদের দীক্ষা কি আশীর্বাদের নয়? অবশ্যই খ্রিস্টবিশ্বাসের সাক্ষ্যদানের অনেক সুযোগ রয়েছে। সুতরাং বলা যায় আমরা সহজাতভাবেই প্রেরিত হয়ে আছি। প্রশ্ন করতে পারি আমি কি আমার বাস্তবতায় আমার খ্রিস্টান পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করি না গর্ববোধ করি?

শিক্ষা ব্যবস্থায় করোনাঘাত ও আমাদের করণীয়

(১২ পৃষ্ঠার পর)

পবিত্র ব্রত হিসেবে শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তার পাশে থেকে প্রয়োজনীয় কাউন্সিলিং সেবাদানে প্রায় ভেঙ্গে পড়া শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা জরুরী।

চরম ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য মানসিক প্রস্তুতিঃ করোনা পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে কে জানে? সকলেরই প্রত্যাশা-প্রার্থনা তাড়াতাড়ি হোক। তবে তা যখনই হোক, ঘটে যাওয়া শিক্ষাবর্ষের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হয়তো নীতি নির্ধারকগণ দ্রুততম সময়ে তুলনামূলকভাবে ছোট্ট সিলেবাসে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন ও আগামী বছরের জন্য উত্তীর্ণের ব্যবস্থা করতে পারেন। সে যাই হোক, বর্তমান শিক্ষাবর্ষ কোন মাস পর্যন্ত হবে? সপ্তাহে কতদিন ক্লাশ হতে পারে? দৈনিক কতঘণ্টা নিজে পড়াশোনা করলে কাঙ্ক্ষিত শিখন ফল অর্জন করা যেতে পারে? পরীক্ষা কয়দিনে সমাপ্ত হবে? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন এখন ভীড় করছে শিক্ষার্থীর মনে। কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যখন পাওয়া যাবে তখন শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী সকলকেই চরম ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলার সময় মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করে পরিশ্রম করা যায় না।

সম্ভাব্য করোনা ঘাটতি বাজেটঃ শিক্ষাবর্ষের হারিয়ে যাওয়া আলোচিত সময়গুলো যদি পুষিয়ে নিতেই হয়, আর্থিক সঙ্কট ও দ্বন্দ্বগুলো যদি পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও মানবিকতার মাধ্যমে সমাধান না হয়, তবে আগামী দিনে সময় ও অর্থের ঘাটতি ও ক্ষতিপূরণের একটি বাজেট যুক্তিসঙ্গত কারণেই আসতে পারে যদিও এবারের জাতীয় বাজেটে তা তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তাই মানবিক দৃষ্টি নিয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, এখনই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহানুভূতিশীল কর্ম পদক্ষেপ নিয়ে বাস্তবায়ন করা, প্রতিষ্ঠান ও অভিভাবকদের পারস্পরিক অসুবিধাগুলো বিবেচনা করে তাদের একটা যুক্তিসঙ্গত অবস্থানে পৌছানো জরুরী, যেন করোনা ঘাটতি বা ক্ষতিপূরণের বাজেটের চাপে পড়তে না হয়।

উপসংহারঃ করোনা লাখ-লাখ মানুষকে জীবন নিয়েছে, সব মানুষের জীবন নাশের হুমকী দিয়েছে আবার জীবনের গভীরে প্রবেশ করে বিশ্ব সৃষ্টি ও স্রষ্টার উপর অনেক সত্যানুভূতি জাগরিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ নিজ-নিজ জীবন-জীবিকায় আতকে উঠেছে, ক্ষতির শিকার হয়েছে, মুচড়ে পড়েছে। ঠিক একইভাবে শিশু কিশোর ও যুবশ্রেণি যারা শিক্ষাকালীন জীবনে আছেন এমন কোটি শিক্ষার্থী, সুনির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষাজীবন শেষ করতে না পারার হুমকীতে আছে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক অর্থনেতিক মন্দার কারণে শিক্ষা জীবনে ফিরে আসার অনিশ্চয়তায় আছে। ক্ষয়ে যাওয়া সময় ও ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার মতো চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার উপায় দায়িত্বশীলদেরই নিতে হবে। সময়োপযোগী বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত এবং শিক্ষক-অভিভাবকের সমন্বিত সহযোগিতাই হয়তো পারবে আমাদের এই শিক্ষা পরিবারের হতাশা দূর করে আগামী দিনের সু-নাগরিকদের গুণগত মানের জীবন গঠনের নিশ্চয়তা দিতে। আর বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিবে নাইবা কেন, শিক্ষাই যে একটি জাতির জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ। আগামী দিনের জাতি কেমন হবে তা নির্ভর করছে আমাদের আজকের গৃহিত সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর। আলোচিত সকল পক্ষ সমন্বিত আন্তরিক প্রচেষ্টা করলে তা অবশ্যম্ভাবী॥ (সমাপ্ত)

শিক্ষা ব্যবস্থায় করোনাঘাত ও আমাদের করণীয়

ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

(২৪ সংখ্যায় প্রকাশের পর)

করোনাঘাতে শিক্ষায় ইতিবাচক আলোচনা

পরিবারিক নৈকট্য ও বন্ধন দৃঢ়করণঃ জীবন-জীবিকার যুদ্ধে, সঙ্গত বাস্তবতার কারণেই কতকাল পরিবারের সবার সাথে সবার পর্যাপ্ত সময় দেওয়া-নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি! এমনকি পরস্পরকে ভালো মত চেনা-জানাও হয়নি। করোনা-লকডাউন ফিরিয়ে দিয়েছে পরস্পরকে আবার কাছাকাছি। সুযোগ হয়েছে পিতা-মাতা পরস্পরের আর সন্তানের সাথে তাদের সম্পর্ক দৃঢ় করতে। একে অপরকে আরো নিবিড়ভাবে জানতে, সন্তানের সম্ভাবনা, প্রবণতা, আবেগানুভূতি, পছন্দ-অপছন্দ, গতি-প্রকৃতি বুঝতে ও সেইভাবে নিজের মনমতো তাকে গড়ে তোলার সুযোগ যা এতোকাল সময় ও সুযোগের অভাবে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটলেও বেশিরভাগ সন্তানের সাথে এ সময়ে পিতা-মাতার বন্ধন আরো গভীর ও দৃঢ় হবারই কথা যা তাদের সকলের কাছে চিরকাল অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

নিজের সুপ্ত প্রতিভাগুলোর বিকাশের সুযোগ ঃ সন্তানকে এ কয়দিনে আবিষ্কার করে পিতা-মাতা নিশ্চয় তাদের সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনাগুলো বুঝে গেছেন। এবার নিজের হাতে সেগুলো ঘষে-মেজে অনুশীলন করিয়ে ক্ষুরধার করতে পেরেছেন। ক্লাশ, কোচিং আর বইয়ের অসহনীয় বোঝা সন্তানের কাঁধে নেই, নেই পরীক্ষা নামক পেষনের চাপ। চাপহীন মুক্তমনে শিক্ষার্থীরা শিখে নিতে পারছে নিজের পছন্দের বিষয়গুলো যেমন, ভিন্ন ভাষা, অংকন, গান, বাজনা, লিখন, আবৃত্তি, পড়া আরো কত কি! সময়গুলো কাজে লাগাতে পারলে এ কয়েক মাস পর সে তার নিজের প্রতিভায় প্রস্ফুটিতই হবে।

শিখন ফলের প্রায়োগিক অধ্যায় ঃ প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি শ্রেণিতে সিলেবাসের অন্তরালে রয়েছে শিখন ফলের সমাহার। পাঠ্য বিষয়ের গভীরে রয়েছে মূল্যবোধ ও আচরণের পরিবর্তনের গুপ্তধন। শিক্ষক নামের জীবন গুরু পাঠদানের সাথে-সাথে প্রতিনিয়ত তাকে দিচ্ছেন মূল্যবোধের ভাণ্ডার। পরিবারে পিতা-মাতারও রয়েছে নিজ সন্তানকে নিয়ে কত বড়-বড় স্বপ্ন যাকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত নিজের রক্তের বিনিময়ে তিলে-তিলে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিশেষ করে চলেছেন তারা। এবার ঘরে অঢেল সময়, নিজের সন্তানকে পর্যবেক্ষণ করার, এতকাল যা শেখানো হয়েছে, সে যা শিখেছে সেগুলো তার জীবনে প্রয়োগের মাত্রাটা কতটুকু তা দেখে নেবার, পরিমাপ করে নেবার, সংশোধন করে দেবার। এখনই সময় নিজের মনের মত করে তার সাথে যাত্রা করে ইতোমধ্যে অর্জিত মূল্যবোধগুলো ব্যবহারিক জীবনে অভ্যস্ত করে তোলা।

ভার্চুয়াল কলা-কৌশলে পারদর্শিতাঃ লকডাউনের পূর্বে বলতে গেলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক তেমন কেউই ভার্চুয়াল কলা কৌশলে পারদর্শি ছিল না। অথচ সময়ের দাবী পূরণ করতে গিয়ে নিজের দায়বোধ থেকে শিক্ষক অভ্যস্ত হচ্ছেন ক্লাশ নিতে, অভিভাবক অভ্যস্ত হচ্ছেন সন্তানের জন্য ক্লাশগুলো অনুসরণ করার সকল ব্যবস্থাকরণে এবং শিক্ষার্থী নিজেও দক্ষ হচ্ছে দৈনিক পাঠদান গ্রহণে। যার টেলিভিশন ছিলো না তিনি তা কিনেছে, যার এন্ড্রয়েড মোবাইল ছিল না তিনি তাও কিনেছেন, যার নেট ছিল না তিনিও নেটের আওতায় আসলেন আর যার ফেইসবুক ছিল না তিনিও সন্তানের জন্য একটি আউডি খুলে নিয়েছেন, এছাড়া অন্যান্য এক্সগুলোতো আছেই। উক্ত করোনা পরিস্থিতি কত মানুষকে তথ্য-প্রযুক্তির আওতায় এনেছে তার হিসেব নেই। কত মানুষকে তা ব্যবহারের কলাকৌশলে দক্ষ করে তুলেছে তা অভাবনীয়। আজ বিশ্বেতো বটেই, আমরাও জাতি হিসেবে এক লাফে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে আরো অনেক ধাপ এগিয়ে গিয়েছি।

মানবিকতার চর্চাঃ করোনাঘাতে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের প্রতিটি মানুষের মাঝে নেমে এসেছে মৃত্যুর ভয়াতঙ্ক, হতাশা, দারিদ্র, কুসংস্কার সর্বোপরি মানুষের প্রতি মানুষের অমানবিক আচরণের প্রদর্শনী। এই অবস্থায় সকলের জন্য সুযোগ এসেছে নিজ বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও মানবিকতার চর্চা করার। মৃত্যুর ভয়ে আতঙ্কিত ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানো, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের সাহায্যে কাজ করা, আয় উপার্জনের মাধ্যম হারানো ব্যক্তি ও পরিবারের সাথে সহভাগিতা করা, করোনা রোগ-রোগী ও মৃত বক্তির দাফন কাফন নিয়ে যে কুসংস্কার ও অমানবিক আচরণ চারিদিকে অমানবিকতার বিষ ছড়াচ্ছে যেখানে সমব্যর্থী হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া এবং উক্ত অভিশপ্ত সামাজিক পরিবেশকে সুস্থতা দান সময়ের দাবী ও তা ব্যবহারের সুন্দর সুযোগের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

আধ্যাত্মিকতায় বলিয়ানঃ 'কর্মই ধর্ম', 'নিজের দায়-দায়িত্ব ঠিকমত পালন করাই ধর্ম পালন করা' ইত্যাদি নানা যুক্তিতে জীবনভর মানুষ কর্মব্যস্ত হয়ে জীবন কাটায়, জীবনের কোন এক পর্যায়ে এসে আত্মোপলব্ধি হয় আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো কতইনা অবহেলিত রয়ে গিয়েছে। তখন হয়তো হাতে আর সময়ও থাকে না। অনুতাপের অনুভূতি নিয়ে চলে যেতে হয় পরপারে। করোনাকালীন সময়ে সকলের জন্য বড় একটা আশীর্বাদের সময় এসেছে

নিজ নিজ বিশ্বাস মতে অবহেলিত আধ্যাত্মিক জীবনে আরো বলিয়ান হয়ে ওঠা, সৃষ্টির প্রতি আমাদের দায়-দায়িত্বগুলো সম্পর্কে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা এবং স্রষ্টার প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা বাড়িয়ে তোলা।

স্রষ্টা, সৃষ্টি ও মানব কর্মের গভীরে যাত্রা: করোনা এক বার্তা নিয়ে এসেছে, 'ভেতরে যাও, গভীরে যাও'। **প্রথমত** স্বাস্থ্যবিধিমতে আমাদের বলা হয়েছে 'লকডাউন, ঘরে থাকুন' অর্থাৎ ভেতরে যাও। বাইরের পরিবেশটাকে দূষণের ফলে, ধ্বংসের ফলে, ভোগের ফলে প্রায় বাস অযোগ্য করে তুলেছিলাম আমরা, এবার প্রতিক্রিয়া এসেছে, বাঁচতে হলে ভেতরে থাকার। **দ্বিতীয়ত** আমাদের কাছে আহ্বান এসেছে, 'গভীরে যাও', সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হিসেবে ধরিত্রী মাতা ও তার প্রকৃতির ওপর আমাদের মানবিক দায়িত্ব কতটুকু নিষ্ঠার সাথে পালন করেছি, ভোগ-বিলাসিতা ও সুবিধাবাদের জন্য কতটুকু অবহেলা করেছি তা নিয়ে আত্মোপলব্ধির গভীরে যেতে। আরো বেশি গভীরে যেতে আহ্বান এসেছে যে, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি, অনুসন্ধান-আবিষ্কার, আর্থিক-রাজনৈতিক-সামরিক-ক্ষমতার উর্ধ্বে একজন রয়েছেন, তাঁর ওপর বিশ্বাসে জীবন-যাপন করতে এবং তিনিই যে সকলের জীবনের মালিক, তা রক্ষা ও ধ্বংসের ক্ষমতাও তাঁর হাতেই এই উপলব্ধি থেকে জীবনের ও আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবনের গভীরতায় গিয়ে শুদ্ধাচারণের আহ্বানের গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ নিয়ে করোনা এসেছে জগতে অবাঞ্ছিত অতিথি হয়ে। করোনা আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ তা করোনাকালের অবসানেই বোঝা যাবে।

করোনাঘাত হতে শিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরণ প্রসঙ্গ উদার, ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গি: সাফ কথা, করোনাঘাতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ আছে, কোথাও-কোথাও শিক্ষকগণ ভার্চুয়াল ক্লাশ নিচ্ছেন, রাষ্ট্রিয়ভাবে টেলিভিশনের বা অনলাইনের মাধ্যমে ক্লাশ নেওয়ার প্রয়াসে কার্যক্রম চলছে, শিক্ষকের কোচিং/প্রাইভেট টিউশন বন্ধ। এমতাবস্থায় সরকারী শিক্ষক বা শিক্ষা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বেতন নিয়মিত পেলেও আধা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সামর্থ অনুযায়ী পূর্ণ বেতন বা আংশিক বেতন দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত আছে। আবার দুঃখজনক হলেও সত্য কোথাও কোথাও- তা বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষকতা এমন একটি জীবন সাক্ষ্যদানকারী ও সম্মানজনক পেশা, তারা চাইলেও অন্য যে কোন পেশা বা মাধ্যমে উপার্জনে নেমে পড়তে পারেন না, যদিও জীবনের দায়ে অনেকেই তা করতে বাধ্য হচ্ছেন। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকমণ্ডলী নিশ্চয় দেখতে চাইবেন না তাদের শিক্ষাগুরু হেন একটি পেশায় নিজে উপার্জন করে সংসার ও জীবন চালাচ্ছেন।

বর্তমান অবস্থার মোকাবেলায়, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ব্যক্তি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই বিবেচনায় আনা আবশ্যক কিভাবে শিক্ষার্থীকে নানাভাবে (ভার্চুয়াল ক্লাস, নিয়মিত যোগাযোগ ও পরামর্শ দান, ইন হাউজ পড়াশুনা ও পরীক্ষায় সহায়তা করা, পরিবারের নানা সঙ্কটে পাশে থাকার মানবিক সমর্থন যোগানো ইত্যাদি) সহায়তা করা যায় এবং শিক্ষক কিভাবে সম্মান নিয়ে টিকে থাকতে পারেন। যে সকল প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ আছে, যতদিন আছে, শেষ দিন পর্যন্ত উদার, ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষকের পাশে দাঁড়ানো জরুরী। অন্যদিকে প্রতিটি পরিবারের কথা মাথায় রেখে শিক্ষার্থীকেও বাস্তবসম্মত আর্থিক ছাড় দিয়ে ঝরে পড়া থেকে রক্ষা করতে হবে। আবার, অভিভাবকদেরও একই মনোভাবে বলিয়ান হয়ে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের পাশে দাঁড়ানো সময়ের দাবী। করোনার অজুহাতে সামর্থ থাকতেও শিক্ষকের বেতন কমিয়ে দেওয়া বা বন্ধ করে দেওয়া যেমন রাষ্ট্র, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, ও কোন ব্যক্তির জন্য ন্যায় বর্জিত হবে, ঠিক তেমনি অভিভাবকদেরও এ সময়ে সন্তানের গঠনদাতা সম্মানিত শিক্ষকের কথা চিন্তা না করে নানা যুক্তি দাড় করিয়ে অসহযোগিতার অবস্থান নেওয়া ন্যায়সঙ্গত হবে না। জাতীয়ভাবে উদার, ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা আজ আশু প্রয়োজন।

পারস্পরিক সহানুভূতি: পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহানুভূতি ছাড়া শিক্ষার এই সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রকে ভাবতে হবে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লাখ-লাখ শিক্ষকের কথা, শিক্ষা পরিবারের প্রায় পাঁচ কোটি সদস্যের কথা, কোমলমতি শিক্ষার্থী যারা এবছরের অপরিপূর্ণ শিখন ফল নিয়ে আগামীতে উচ্চতর শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবে তাদের নানা দিকের কথা, অভিভাবক তথা জনগণের আয় উপার্জনের দুরাবস্থার কথা। পাশাপাশি শিক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকেও গভীরভাবে ভাবতে হবে শিক্ষার সাথে জড়িত পরিবারগুলোর বাস্তবতার কথা। অন্যদিকে শ্রদ্ধেয় অভিভাবকদেরও ভাবা প্রয়োজন সন্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক যেন টিকে থাকে এবং দুর্যোগকাল শেষে খুশি মনে, পুরো ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং উদ্যম ও গতি নিয়ে সন্তানের জীবন থেকে ক্ষয়ে যাওয়া অতি মূল্যবান সময় ও লোকসান পুষিয়ে নেয়ার জন্য অকৃপণভাবে আত্মনিয়োগ করার প্রেরণা পান। উভয় শ্রেণির সক্ষমতা ও অপারগতার বিষয়গুলো বিবেচনা করে পারস্পরিক সহানুভূতিশীল অনুভূতির দায়িত্বশীল মিথক্রিয়ায় হয়তো সম্ভব করোনা শেষে সকল ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার প্রত্যাশা করা। যে যার যুক্তিতে অবস্থান নিলে, নিজের দাবী ও সুবিধা আদায়ের কথা ভাবলে, সামর্থ থাকতেও অপরকে বঞ্চিত করার মনোভাব ধরে রাখলে, বর্তমানে ঘটে যাওয়া ক্ষতিগুলো আগামী দিনে পুষিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যেতে পারে।

যোগাযোগ বৃদ্ধি ও কাউন্সেলিং: এত লম্বা সময় বন্দি জীবন, হাতে কাজের তালিকা নেই, নেই পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত ও শিক্ষাদানে অভ্যস্ত, দক্ষ শিক্ষক, বাবা মায়ের শাসন কিংবা অতিশাসন বা বিষয় জ্ঞানের অনভ্যস্ততা ও অপারদর্শিতায় সৃষ্ট বিরক্তি, কোন কোন ক্ষেত্রে তার উপর সৃষ্ট শারীরিক বা মানসিক চাপ এবং নির্যাতন, পরিবারে আর্থিক সঙ্কটে সৃষ্ট বড়দের কলহ, কর্মহীন লম্বা অলস সময় ব্যবহারে অনভিজ্ঞতা, সামনে পড়ালেখার কি হবে, পরীক্ষা কবে হবে, সিলেবাস কিরূপ হবে, সহপাঠিদের সহযাত্রার অভাববোধ, পরিবারে সহায়তা করতে উপার্জনের চাপ, কোন-কোন ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের চাপ, যৌন নির্যাতনের শিকার ইত্যাদি আরো অসংখ্য পরিস্থিতির শিকার শিক্ষার্থীরা। তাদের মানসিকভাবে ভারসাম্য রাখতে, আশু পরিস্থিতিতে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে ও মোকাবেলা করতে শিক্ষকগণের নিয়মিত যোগাযোগ, উপদেশ, পরামর্শ ও পরিচালনা এ মুহূর্তে অতীব জরুরী। এসময়ে শিক্ষার্থীদের পাশে শিক্ষক আছেন, তার যাত্রায় শিক্ষক সহযাত্রী, তার দুঃখ ও সমস্যায় শিক্ষক সমব্যথী এ জাতীয় উপলব্ধি নিজেকে অনেকটা সামলে নিতে সহায়তা করতে পারে। যদিও শিক্ষক নিজেও করোনাঘাত মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছেন, তারও পরিবার পরিজন আছে, তারও জীবনের হুমকী রয়েছে, তারও আর্থিক সঙ্কট আছে, ব্যক্তি ও পরিবার হিসেবে তিনিও অপরাপর সকলের মতোই সমস্যাগুলো মোকাবেলায় প্রায় ক্লান্ত তবুও মানুষ গড়ার

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আমার স্মৃতির ভান্ডার

ডাঃ নেভেল ডি রোজারিও

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবুর রহমান ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুদিবসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নামকরণ করেন "বাংলাদেশ"। "জনগণের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তান এর পরিবর্তে বাংলাদেশ হবে।"

পরবর্তীতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ঢাকসু'র তৎকালীণ ভিপি আসম আব্দুর রব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির জনক' উপাধি দেন। শেখ মুজিবুর রহমান একজন রাজনীতি সচেতন মানুষ হিসেবে উপলব্ধি করতেন যে, রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমেই বৃহৎ কল্যাণ সম্ভব। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন গণমানুষের নেতা। তিনি যেমন নিস্বার্থভাবে জনকল্যাণের রাজনীতি করতেন, তেমনি জনগণের ভালোবাসাও পেয়েছেন। তাঁর মুক্তির দাবিতে রাজপথে বিশাল মিছিল, ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ-অনশন এসব তারই প্রমাণ। বাংলার আপামর জনগণের বন্ধুর স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে তৎকালীন ঢাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সর্বপ্রথম ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় সমবায়, কৃষি ও বন বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় শিল্প, শ্রম ও দুর্নীতি দমন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। পার্টির কাজে আরও বেশি নিয়োজিত হবার কারণে তিনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব নেন।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব ৬-দফা পেশ করেন। বাঙালিরা মুক্তির সনদ ৬-দফাটির প্রতি তাঁর দলের সিনিয়র প্রায় নেতারই সমর্থন না থাকাতে শেখ মুজিব ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ৬ দফাকে জনগণের কাছে পৌঁছাতে। ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীবাহিনী শেখ মুজিবকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিল এবং ডাকসু'র নেতৃত্বে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন নিয়ে গঠিত 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ১১-দফার অন্যতম দাবী হিসেবে ৬-দফাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিল। ছাত্র-জনতার দুর্বার আন্দোলনে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব শাহীর পতন হয় এবং শেখ মুজিব 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' থেকে অব্যাহতি ও মুক্তি পায়।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তিনি পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা না ছাড়তে চাইলে তাঁর ডাকে সারা বাংলায় শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চ, বাঙালি জাতির নতুন দিগন্তের সূচনায় ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন- "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। তবু এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ৭ মার্চের ভাষণে (যা পরবর্তীতে UNICEF কর্তৃক বিশ্বের ১০০টি শ্রেষ্ঠ বক্তৃতার অন্যতম হিসেবে স্বীকৃত) আঁচ করা যায় যে তিনি আগাম যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশনা দিয়েছেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জ্যাকব এফ ফিল্ড তার *'We shall fight on the Beaches. The speeches that inspired History'* গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় ভাষণটি যুক্ত করেন। ৭ মার্চের এ ভাষণটিকে আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে যুদ্ধকালে দেয়া বিশ্বের অন্যতম অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তৃতা হিসেবে চিহ্নিত। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ ভাষণটি ১২টি বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতারের পূর্বমুহূর্তে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, "This is my last message to you. From today Bangladesh is independent." ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম এম এ হান্নান নিজ কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর সে ঘোষণা পাঠ করেন। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান একই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা *'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'* গ্রন্থের ভূমিকাতে উল্লেখ করেন, "১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর-পরই আমাদের ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হানা দেয় এবং আমার পিতাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।" বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে সমগ্র বাঙালি মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-মুসলিম, বাঙালি-আদিবাসীর এক সাগর অভিন্ন রক্তস্রোত পেরিয়ে মুক্তিপাগল দামাল ছেলে-মেয়েরা ছিনিয়ে এনেছে বাংলার স্বাধীনতার সূর্যটাকে। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি প্রধানমন্ত্রীত্বও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এমন এক শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যেখানে সবাই সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। আর এ জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ও রসিক মানুষ। তিনিই প্রথম ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বশান্তি পরিষদের দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মাননা 'জুলিও কুরী' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে আলজারিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) চতুর্থ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ও কিউবা ছিল। তখন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সাক্ষাত হয়। সে সময় তিনি বঙ্গবন্ধুকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, *"I have not seen the Himalayas; but I have seen Sheikh Mujib. In personality and in courage this man is the Himalayas."* "আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনিই হিমালয়।"

যার অঙ্গুলী হেলনে কোটি মানুষ প্রাণ বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই মহামানব ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিপদগামী একটি অংশের নরঘাতক, দেশী ও বিদেশী চক্রান্ত বাস্তবায়নে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সপরিবারে হত্যা করে বাংলার মাটিকে কলঙ্কিত করে। এরপর যারাই ক্ষমতা দখল করেছে তারাই বঙ্গবন্ধুকে মানুষের মন থেকে মুছে নতুন প্রজন্মকে অন্ধকারে রেখে তাঁকে ইতিহাস থেকে নির্বাসিত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিল। কিন্তু এটাই বাস্তবতা যে বাংলার জনগণ ও নতুন প্রজন্ম ২২ বছর পরে হলেও সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে ফিরিয়ে এনেছে তাদের হৃদয়ের মণি বঙ্গবন্ধুকে আর সহার্পণ করেছে শ্রদ্ধার আসনে। তাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপনের সাথে-সাথে উচ্চারণ করতে চাই অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতা-

"যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরি, যমুনা বহমান।

(সমাপ্ত)

পিতৃতুল্য আদর্শ পালক ও খ্রিস্টসেবক আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি

শান্তি রানী সিস্টারস্

মহান গুরু যিশু খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মণ্ডলীতে বহু নিবেদিত প্রাণ নারী পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। যুগ-যুগ ধরে তারা সেই যিশু খ্রিস্টের জীবনাদর্শ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে তাঁর সেবা করে গেছেন ও যাচ্ছেন। সেই মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে তেমনি একজন উত্তমপালক, খ্রিস্টসেবক, দক্ষ প্রশাসক, আদর্শ সন্ন্যাসব্রতী, প্রয়াত শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি। আর্চবিশপ মজেস কস্তা একটি নাম, একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব, এক আধ্যাত্মিক মানুষ, সুদক্ষ নেতা। তিনি দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ তথা বাংলাদেশ মণ্ডলীর এমন একজন জনপ্রিয় পালক যিনি দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে পনেরো বছর ও চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে নয় বছর মোট চব্বিশ বছর ধরে বাংলাদেশ মণ্ডলীকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে গেছেন। আর্চবিশপ তার বিশপীয় জীবনে যে অবদান রেখে গেছেন তা কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে। তার পরলোকগত হওয়াকে আমাদের মত অনেকে, বাংলাদেশ মণ্ডলীর নক্ষত্রের পতন আখ্যায়িত করে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। অনেক ভক্তের মতো আমাদেরও আক্ষেপ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কি এই শ্রদ্ধাভাজনকে দিয়ে মণ্ডলীর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করাতে পারতেন না? আর কিছুদিন এ পৃথিবীতে থেকে গেলে কিবা এমন ক্ষতি হতো? কারণ অনেক অনাথ, অসহায় আশাহীন মানুষ এই মহান ব্যক্তির মধ্যদিয়ে পেয়েছে আশা, দেখেছে নতুন স্বপ্ন, খুঁজে পেয়েছে আশ্রয়। অনেকে আবার সঠিক দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ লাভ করে মণ্ডলীতে অবদান রেখে যাচ্ছেন।

উত্তরবঙ্গ দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ ও দক্ষিণে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে, শিক্ষা বিস্তারে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রদ্ধেয় বিশপের যুগোপযোগী ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই সাথে বাংলাদেশ মণ্ডলীর স্থানীয় সন্ন্যাস সংঘ ''দূতগণের রাণী মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের ক্যাটেখিস্ট সন্ন্যাস সংঘ (শান্তি রাণী) এর জন্য তার যে অবদান তা অতুলনীয়। তার স্নেহ-ভালবাসা, দিক-নির্দেশনা, শিক্ষা ও পরামর্শ দান আমাদের কাছে তাকে পিতৃতুল্য করে রাখবে।

শান্তি রাণী সন্ন্যাস সংঘ দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের একটি স্থানীয় সন্ন্যাস সংঘ। সুতরাং দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপই হলেন এই সংঘের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ সংঘ প্রতিষ্ঠাতা বিশপ যোসেফ অর্বেট পিমে। বয়সের ভারে অসুস্থ হয়ে ইতালিতে প্রত্যাবর্তন করার প্রাক্কালে নব অভিষিক্ত বিশপ মাইকেল রোজারিও এর কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় বলেছিলেন "এই যে সহায় সম্পদ, নথিপত্র, বিষয়াদি যা আমি আপনাকে দিলাম, তা সবই হচ্ছে ধর্মপ্রদেশের সম্পদ। কিন্তু আমার একান্ত নিজস্ব একটি সম্পদ আছে, যা আমি আপনাকে দিচ্ছি তা হলো আমার প্রিয় সন্তানতুল্য 'শান্তি রাণী সিস্টারস্ সংঘ। আপনি এর রক্ষনাবেক্ষণ করবেন।" এ কারণেই প্রতিষ্ঠাতার উত্তরসুরী বিশপগণ হয়ে ওঠেন 'শান্তি রাণী সিস্টারস্ সংঘের প্রেরণাদাতা, আধ্যাত্মিক পিতা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। ফলে বিশপগণও এ সংঘ পরিচালনায় ও দিক-নির্দেশনা দানে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তারই পরিক্রমায় ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ ৬ সেপ্টেম্বর পিতৃতুল্য পালক আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর শিঘ্রই তিনি সংঘ - প্রতিষ্ঠাতার প্রিয় সন্তানতুল্য সংঘের পরিচর্যার ভার গ্রহণ করেন। মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে দিনাজপুরের ষষ্ঠ বিশপ হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। বিশপ হওয়ার পূর্ব থেকে তিনি বিভিন্ন সময়ে সংঘের সিস্টারদের জন্য বার্ষিক নির্জন-ধ্যান পরিচালনা, শিক্ষা সেমিনার ও ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক পরিচালনার মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন। সুতরাং তার কাছ থেকে লাভ করেছি শিক্ষা, জ্ঞান, সুপরামর্শ, পিতৃসুলভ ভালবাসা এবং সহযোগিতা। দীর্ঘ পনেরো বছর দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল হিসেবে থাকা অবস্থায় ব্যক্তিগত অথবা সমবেতভাবে আলাপ বা সাক্ষাত হয়েছে বহুবার। এই দীর্ঘ পথ চলায় অনেক প্রীতিময় স্মৃতি মনে পরছে। সব লিখে প্রকাশ করার অবকাশ না থাকলেও, কিছু না লিখে প্রকাশ করতে না পারলে নিজেদের অপরাধী বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই কাছে ও দূরে থেকে জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নে বিশপের কিছু গুণাবলি তুলে ধরার দুরাত্ম দেখাতে চেষ্টা করছি।

আধ্যাত্মিক ব্যক্তিঃ একজন প্রকৃত মেষপালকের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি থাকা প্রয়োজন সেগুলি সবই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি আদর্শ পালক, পিতা ও একজন নির্ভীক ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মগুরু ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবে তিনি পবিত্র ও প্রার্থনাশীল মানুষ ছিলেন। একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হিসেবে তিনি তার দৈনিক প্রার্থনায় খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন। যাত্রাপথে ও কাজে ব্যস্ত থাকলেও তিনি প্রার্থনায় বিশ্বস্ত ছিলেন। বিশপ সবসময় বলতেন "প্রার্থনা ছাড়া ঐশইচ্ছা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। প্রতিদিনই ঐশইচ্ছা আবিষ্কার ও পালন করা আমাদের সন্ন্যাস জীবনের আধ্যাত্মিক সাধনা।" তিনি সবসময় চাইতেন সিস্টারগণ যেন কমিউনিটি প্রার্থনায় বিশ্বস্ত থাকেন এবং সেদিকে নজর দিতে তিনি কমিউনিটির সুপিরিয়রদের বিশেষ পরামর্শ দিতেন। ঈশ্বর নির্ভরশীল হয়ে জীবন-যাপন করা নিবেদিত জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, তিনি প্রায়ই এ বিষয়টির ওপর জোর দিতেন। আধ্যাত্মিকতার সৌন্দর্য ও পবিত্রতার ভাব তার জীবন-যাপনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

অসুস্থ ও বয়স্ক সিস্টারদের প্রতি বিশেষ মনোযোগঃ অসুস্থ ও বয়স্ক সিস্টারদের প্রতি বিশপ মহোদয়ের বিশেষ নজর ও মমত্ববোধ ছিল। তিনি দিনাজপুরে থাকাকালীন, এমনকি চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে গিয়েও সবসময় অসুস্থ ও বয়স্ক সিস্টারদের খোঁজখবর নিতেন। সময় পেলেই তিনি বয়স্ক সিস্টারদের সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন ও সাক্রামেন্তীয় সেবা দিতেন। সংঘের নবীন সিস্টারদের অনুপ্রেরণা দেবার জন্য সবার সামনে প্রবীণদের সেবাকাজে স্বীকৃতি

দিতেন। কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে বা মারা গেলে সব সময় তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন ও তাদের জন্য সুব্যবস্থা করতেন। আমাদের সংঘের কোন সিস্টার মারা গেলে বিশপ সবসময় চেষ্টা করতেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খ্রিস্টযাগ অর্পণ করে তাকে সমাহিত করতে। এটা তার পিতৃত্ব ও কোমল নরম হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ ।

গঠন পরিচালনায় বিশপ মজেসের সহযোগিতা: বিশপ নিজে একজন গঠন পরিচালক ও আধ্যাত্মিক পরিচালক হওয়ায় তিনি প্রায়ই আমাদের সংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের গঠন পরিচালিকাদের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন ও বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন। সময় করে গঠনগৃহ পরিদর্শন করে প্রার্থী ও নব্যাদের শিক্ষা দিতেন ও ব্যক্তিগত আলাপ করতেন। গঠনদানে যে বিষয়গুলো তিনি গুরুত্ব দিতেন তা হলো- প্রার্থীদের সাথে মাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক, পরিচালিকাদের প্রার্থনাশীল ও ত্যাগী ব্যক্তি হওয়া, প্রার্থীদের নিয়মিত ও সঠিক মূল্যায়ন করা, প্রৈরিতিক মনোভাব গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি একজন আদর্শ সন্ন্যাসব্রতী হয়ে ওঠা। সংঘের গঠন প্রার্থী ও সিস্টারগণও যেন নিয়মিত আধ্যাত্মিক পরিচালকের পরামর্শ গ্রহণ করেন সেদিকে তিনি বিশেষ নজর দিতেন। উপলব্ধি করেছি একজন স্নেহশীল পিতা তার সন্তানের গঠনের জন্য এভাবেই চিন্তা করে থাকেন।

মানবীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব: ব্যক্তি জীবনে তিনি এতটাই আন্তরিক ছিলেন যে, কখনো কাউকেও ছোট করে দেখেনি। মূল্য ও মর্যাদা দিয়েছেন ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার উপর। সংঘের সকল সিস্টারের কথাই তিনি চিন্তা করতেন – বিশেষ করে সংঘের যে কোন সিস্টার যখনই তার কাছে কোন প্রয়োজনে সময় চেয়েছি বিশপ মহোদয় ব্যস্ত থাকলেও সময় নিয়ে আমাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনেছেন। কেউ কোন কিছু বললে বা সহযোগিতা চাইলে ধীর-স্থিরভাবে ও বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত, পরামর্শ ও সমাধান দিতেন। কার মাধ্যমে কি কাজ হবে, কোন সিস্টারকে কোন স্থানে সেবাদায়িত্বে নিয়োগ করলে সত্যিকারভাবে মণ্ডলীর জন্য উপকার হবে সে বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল ও উপদেষ্টাদের সাথে আলাপ ও পরামর্শ করতেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি সংঘের প্রার্থী থেকে শুরু করে সকলকে খুব ভালভাবে চিনতেন এবং সকলের নাম মনে রাখতে পারতেন। তার প্রতিটি কথা ও সিদ্ধান্তে গভীর অর্থ ও দূরদর্শী চিন্তা খুঁজে পেয়েছি।

প্রৈরিতিক মনোভাবে বেড়ে উঠা : ব্যক্তি জীবনে বিশপ সত্যিকারভাবে মনে-প্রাণে একজন মিশনারী ও প্রৈরিতিক মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। তাই সময় সুযোগ হলেই ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর গ্রাম পরিদর্শনে যেতেন এবং সঙ্গে সিস্টারদেরও নিয়ে যেতেন। আর এভাবে তিনি সংঘ প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য সংঘের ক্যারিজমের (অনুগ্রহদান) উপর বিশেষ নজর দিয়েছেন। আমরা যেন ক্যারিজম থেকে বিচ্যুত না হই বরং যুগলক্ষণ অনুযায়ী বাণীপ্রচারের বিভিন্ন যুগোপযোগি পন্থা অবলম্বন করে মণ্ডলীকে আরও সহায়তা করতে পারি সে দিকে বিশেষ পরামর্শ ও নজর দিয়েছেন। এমনকি প্রত্যক্ষভাবে প্রৈরিতিক কর্মে নিয়োজিত সিস্টারদের জন্য ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে নিয়মিত নির্জনধ্যান, কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার উপর প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সেমিনারের মধ্যদিয়ে গঠন দিতেন।

দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি: সংঘের প্রতিষ্ঠাতার উত্তরসূরী হিসেবে সংঘের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব পালন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। সংঘকে স্বাবলম্বী করার জন্য বিভিন্ন সেবাদায়িত্বে বিশেষ করে হাসপাতাল ও স্কুলে বেশি সংখ্যক সিস্টার নিয়োগ দেয়ার জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং প্রয়োজনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সংঘকে তিনি অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে দেখতে চাইতেন এবং তা করার নির্দেশও দিতেন। সব রকম কাজ কিভাবে পদ্ধতিগতভাবে করা যায় সেই শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন-রেকর্ড রাখা, হিসাব সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। তিনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বা যুগলক্ষণ দেখে বিচক্ষণতার সাথে অভিজ্ঞ লোকদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করতেন। বহুকাজের ব্যস্ততার মাঝেও কর্তব্যকর্মে সময়নিষ্ঠতা সকলের অনুকরণীয়।

সংঘের প্রতি তার মমত্ববোধ: আমাদের সিআইসি পরিবারে বিশপ মহোদয়ের অবদান ছিল নানামুখি। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিও তিনি জোর দিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেছেন এবং সংঘের প্রয়োজনে দেশের বাইরে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। দিনাজপুরে থাকতে মহাসভাগুলোতে উপস্থিত থেকে সিস্টারদের মনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে তার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে আমাদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জও দিতেন, যাতে আমরা বাংলাদেশ মণ্ডলীতে আরও অবদান রাখতে পারি। আমাদের শান্তিরাণী সন্ন্যাস সংঘটি দেশীয় সংঘ হিসেবে এর উন্নয়ন করা, স্বাবলম্বী হওয়া ও মণ্ডলীতে এর অবদান কিভাবে আরও সক্রিয়ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় এ বিষয়ে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন।

ধর্মপ্রদেশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ: দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ছেলেমেয়েরা যেন প্রকৃতভাবে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও শিক্ষালাভে বেড়ে উঠতে পারে এ উদ্দেশে তিনি বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে স্কুল নির্মাণ করে শিক্ষার আলো বিস্তারে ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও ধর্মপ্রদেশে বিভিন্ন স্থানের হারানো সম্পদ যেমন– লালমনিরহাট গির্জাঘর, খালিপপুরে ২১ বিঘা জমি, বড়দলে ভূমিদস্যুদের হাত থেকে আদিবাসিদের জমি উদ্ধার, ঠাকুরগাঁও কিছু জমি পুনঃউদ্ধার করার মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রদেশ তথা জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন অদম্য সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে।

বিশপ মহোদয়ের মানবতাবোধ ছিল প্রবল কিন্তু ন্যায় ও সত্যের নীতিতে থেকেছেন অটল। তার দেখানো পথ, শিক্ষা, আদর্শ আমাদের সকলের জন্য প্রেরণা ও শক্তি। ''দূতগণের রাণী মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের ক্যাটেখিস্ট সন্ন্যাস সংঘের ভগ্নিরা'' স্বর্গীয় পিতৃতুল্য পালক ও পরিচালক আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি এর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমাদের সংঘের প্রতি তার অবদান অনস্বীকার্য।

স্বর্গীয় পিতা তাঁর চরণতলে এই উত্তমপালক ও খ্রিস্ট সেবককে তার সুন্দর জীবনের পুরস্কার হিসেবে অনন্ত স্বর্গসুখ দান করুক এই আমাদের প্রার্থনা। আমরা যেন অব্যাহতভাবে তার গুণাবলী চর্চার মাধ্যমে আমাদের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তুলতে পারি এবং আমাদের প্রেরণকাজে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারি॥ ❑

স্যালুট : বীর মুক্তিযোদ্ধা ফাদার হোমরিক

মিথুশিলাক মুরমু

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফাদার হোমরিক ২৫ জুলাই নিজ দেশে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছেন। এক বুক অভিমান নিয়েই নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ফাদার ইউজিন ই হোমরিক। দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে অত্যন্ত সাহস নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, বাঁচিয়েছিলেন অনেক মানুষের মান-সম্মান, সম্ভ্রম ও জীবন। মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর বর্বরতায় সমগ্র বিশ্ব বিবেক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো, বিশ্ববাসী জেনেছিলো সংবাদ মাধ্যমে; আর তিনি ছিলেন একজন জীবন্ত সাক্ষী। পাক-বাহিনীর চোখরাঙানিকে তোয়াক্কা না করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করতে। স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সম্মাননা প্রদান করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে যার অসীম অবদান, তাঁকেই এক সময় আমার বাংলাদেশ ঠাঁই দিতে পারেনি। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে এক স্থানীয় দৈনিক লিখেছিলো, 'মূলত বয়স আর সাম্প্রতিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যায় তিনি ফিরে যাচ্ছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত কয়েক মাস আগে তাঁকে মোবাইল ফোনে এসএমএস দিয়ে হুমকি দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। এরপর থেকে তিনি পুলিশ বেষ্টিত জীবন-যাপন করছিলেন' *(আগস্ট ১৩, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ, দৈনিক দেশের খবর. নেট)*। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে টগবগে তরুণ হোমরিক পূর্ব পাকিস্তানকে সেবা ও সাক্ষ্যের আঁকরভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। আমেরিকার উন্নত জীবনের মসৃণ পথ তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি কারণ তাঁর হৃদয় পূর্ণ ছিলো ত্যাগে, মমত্ববোধ এবং ভালোবাসায়। প্রভু যিশু খ্রিস্টের আদর্শকে অনুসরণ করে পাড়ি দিয়েছিলেন সাত-সমুদ্র তেরো নদী; আমেরিকা থেকে হাজার-হাজার ক্রোশ দূরবর্তী 'হিদেন' খ্যাত পূর্ব পাকিস্তানে। পবিত্র হলিক্রশ সংঘের ফাদার হোমরিক ঢাকা নটরডেম কলেজের বাংলা অধ্যাপক মিয়া মোহাম্মদ আবদুল হামিদের কাছে বাংলার হাতেখড়ি নেন। এখানেই কিছুদিন থাকার পর ঢাকার নবাবগঞ্জ গোল্লা ধর্মপল্লীতে ৩ বছর অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি ময়মনসিংহ শহর ও হালুয়াঘাটে স্থানান্তরিত হন। মাত্র ৯ মাসের মধ্যেই স্থায়ী জায়গায় অর্থাৎ টাঙ্গাইলের মধুপুরে থিতু হয়েছেন, সময়টি ছিলো ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ। ৯টি মাস হালুয়াঘাটের বিড়ইডাকুনিতে সেবা দিয়েছিলেন। তৎকালীন আর্চবিশপ গ্রেণার তাঁকে ফাদার ষ্টিফেন ডায়াসের স্থলে স্থলাভিষিক্ত করেন। জলছত্র ধর্মপল্লীর প্রথম পালক পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বার্ণাড হোমরিক ও ইলা ভ্যালির চতুর্থ সন্তান হোমরিক। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৮

ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের মার্সি হাসপাতালে জন্ম নেওয়া ফাদার হোমরিক 'সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন, সমস্ত শক্তি' দিয়ে খ্রিস্টকে ভালোবেসে অবহেলিত, নিষ্পেষিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। একটি পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠী, একটি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকা এবং নিরক্ষর সর্বস্তরের মানুষের আলোর দিশারী হয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যে সময়টিতে এসেছিলেন, সে সময়টিতে মধুপুর জঙ্গলের আয়তন ছিলো প্রায় ২৫০ বর্গমাইল। জঙ্গলে ছিলো বাঘ, বানর, হরিণ, সাপ, ময়ূর, বনমোরগ ও হরেক প্রকারের পশুপাখি। মান্দিদের সংখ্যা ছিলো প্রায় আড়াই হাজারের মতো। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিনি একে-একে গড়ে তুলেছেন ৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জলছত্রে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'কর্পোস খ্রিষ্টি উচ্চ বিদ্যালয়' এবং পীরগাছায় সেন্ট পৌল'স উচ্চ বিদ্যালয়। মান্দি ছেলেদের জন্য ২টি ছাত্রাবাস ও মেয়েদের জন্যও ২টি ছাত্রীনিবাস স্থাপন করেন। বিশুদ্ধ জলের অভাব পরিপূরণে কূপ, নলকূপ, গভীর নলকূপ স্থাপন করেছেন। তিনি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি মান্দিদের ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রক্ষায় নিরলস পরিশ্রম করেছেন। মান্দি নাচ, গান, সেরেনজিং রেরেগ্রিকা, গোরিরোওয়া পরিবেশনের মাধ্যমে তাদের সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার জন্য তার প্রাণপণ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তিনিই প্রতি শুক্রবার আচিক ভাষায় গির্জা চালু করেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যেখানেই মানবতা লঙ্ঘিত হয়েছে, তিনি সরব হয়েছেন; পৌঁছিয়েছে ভালোবাসার হাত। এই শিক্ষানুরাগী নিজেও আমেরিকার মেরিনল কলেজ ও মিশিগান নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় মনোযোগী হোমরিক সেন্ট যোসেফ বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণী সমাপ্তিতে ১৪ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পবিত্র ক্রুশ সেমিনারীতে বিভিন্ন দেশের সেমিনারীয়ানদের সংস্পর্শে সমৃদ্ধ হয়েছেন। স্নাতকের পরই ওয়াশিংটন ডিসিতে থিওলজি (ঐশতত্ত্ব) বিষয়ে অধ্যয়ন করেন এবং বাংলা ভাষা, হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা করেন। বলতেন, 'শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। তাই ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক গুণাবলী অক্ষুন্ন রাখতে হবে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সেই সঙ্গে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে হবে।' স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নেও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে হ্যাঁ, একজন ধর্মানুরাগী হয়েও তিনি কারো প্রতি ধর্মকে চাপিয়ে দেননি। মানুষের প্রতি তার যে দরদ, ভালোবাসা এবং সহযোগিতা; এটিই ছিলো একজন সত্যিকার খ্রিস্টপ্রেমিকের মশালস্বরূপ।

মার্কিন নাগরিক ফাদার ইউজিন ই হোমরিক মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা এবং নির্যাতিত মুক্তিকামী বাঙালিদের বনাঞ্চলে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক অবদান রাখেন। এই বিদেশী মুক্তিযোদ্ধা টাঙ্গাইলের মধুপুর বনাঞ্চলের সেন্ট পৌলস্ চার্চে ছয় দশক কাটিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান সিটিতে জন্ম হওয়া ফাদার হোমরিক ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে এবং ৫৯ খ্রিস্টাব্দে মধুপুর বনাঞ্চলের জলছত্র খ্রিস্টান মিশনে ধর্মপ্রচার পাশাপাশি কুষ্ঠ হাসপাতাল পরিচালনায় যোগদান করেন। "ফাদার ইউজিন হোমরিক ও ফাদার রোনাল্ড যুদ্ধের সময় তারা জলছত্র মিশনের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁরা হাজারেরও বেশি নারী, শিশুসহ হিন্দুদের এই মিশনে আশ্রয় দেন। তাদের দেখাশোনা, খাওয়া-দাওয়া, চিকিৎসা, ইত্যাদি ফাদার হোমরিক

নিজে করতেন। ফাদার ট্রিপির তত্ত্বাবধানে জলছত্র মিশনের ইদিলপুর গ্রামে হাজার খানেক খ্রিস্টভক্ত আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ছয় মাস সেখানে অবস্থান করে। জলছত্র মিশনের আশেপাশের গ্রামের দেড়শ লোককে লাইনে দাঁড় করানো হয়। তখন ফাদার হোমরিক সেখানে ছুটে গিয়ে পাকসেনাদের বলেন, 'ওদের গুলি করার আগে আমাকে গুলি করো।' অনেক আলোচনার পর পাকসেনারা ঐ লোকগুলোকে ছেড়ে দেয়। প্রাণে বেঁচে যায় তারা।" মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা জয়দেবপুর থেকে ময়মনসিংহে যাওয়ার পথে মেজর সফিউল্লাহর নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন অফিসার কয়েকদিন জলছত্র মিশনে অবস্থান করেন। এর মধ্যে খবর পাই পাকবাহিনী যশোরে ফাদার মারিও নামের এক ধর্মযাজককে গুলি করে হত্যা করেছে। এ সময় ১২ এপ্রিল মার্কিন দূতাবাসের দুজন কর্মকর্তা জর্জ মলিতা ও বার কলিন্স এসে আমাকে অবিলম্বে ঢাকায় নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু নিরীহ আদিবাসী ও বাঙালিদের বন্দুকের সামনে রেখে নিজের একা নিরাপদ স্থানে চলে যেতে মন টানেনি। ফাদার হোমরিক বলেন, ১৮ এপ্রিল পাকসেনারা মধুপুর দখল করে নেয়। শুরু হয় তাদের লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন। মধুপুর, মুক্তাগাছাসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ২০ হাজার মানুষ (অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী) নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে মধুপুর বনাঞ্চলে আসেন। আমরা বনাঞ্চলের বিভিন্ন গারো পল্লীতে এদের নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করি। মধুপুরের চেয়ারম্যান অমূল্য নিয়োগীসহ অনেকেই জলছত্র মিশনে লুকিয়ে রাখি। যুদ্ধ চলাকালে ময়মনসিংহ থেকে ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী এনে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও পাকবাহিনীর হাতে নির্যাতিতদের জলছত্র কুষ্ঠ হাসপাতালে গোপনে চিকিৎসা দেওয়া হতো। সিস্টার সিসিলিয়া ও সিস্টার দত্তা এ সময় হাসপাতালে এই সেবাকার্যে নিয়োজিত ছিল। আগস্ট মাসের মাঝামাঝিতে মুক্তাগাছার মাইকোণা গ্রামে পাকবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দালালরা আক্রমণ করে। তারা গ্রামবাসীকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। পাকবাহিনী চলে যাওয়ার পর সেখানে গিয়ে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করি আমরা। তিনি বলেন, বনাঞ্চলেও পাকবাহিনীদের নিয়ে আসতো স্থানীয় রাজাকাররা। তারা নানাভাবে আমাকে হয়রানির চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের ভয়ে ভীত না হয়ে গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবাসহ নানা রকম সহায়তা অব্যাহত রাখি। অনেক সময় মুক্তিযোদ্ধারা মিশনে অস্ত্র গোলাবারুদ রেখে যেত। সুযোগ বুঝে এসে তা নিয়ে অপারেশনে যেত।...ফাদার হোমরিক বলেন, জামালপুর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের তাড়া খেয়ে পাকবাহিনী মধুপুর হয়ে ১০ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের দিকে চলে যায়। বুঝতে পারলাম হানাদাররা আর টিকতে পারছে না। ১১ ডিসেম্বর মধুপুরসহ পুরো টাঙ্গাইলে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। এ খবর পেয়ে বনাঞ্চলের গারো পল্লী ও মিশনে আশ্রয় নেয়া বাঙালিরা বের হয়ে আসে। তারা স্বাধীন দেশের পতাকা নিয়ে জয় বাংলা ধ্বনি তুলে মিছিল বের করে। শিশু কিশোররাও যোগ দেয় সে মিছিলে। অবরুদ্ধ দিনের অবসান হয়।' স্বর্গমর্ত পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফাদার বলেছিলেন, 'অর্থনৈতিক এই চাপ শুধু তাদের জন্য নয়, সারা বাংলাদেশের। বাংলাদেশে এখন ৬৫% জনসংখ্যা ভূমিহীন, এই অর্থনৈতিক চাপে ও রাজনৈতিক অবস্থার জন্য অনেক গারো পরিবার অনিশ্চয়তার পথে দেশান্তরে চলে গেছে। অথচ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এদের (গারো) অবদান কত বড় ছিল। ঐ সময় পাকবাহিনীর আক্রমণের শিকার প্রায় ২০,০০০ হাজার হিন্দু-মুসলিমকে এখানকার মান্দিরা অত্যন্ত সাহসের সাথে আশ্রয়, খাদ্য ও বস্ত্র দান করেছে। অসংখ্য মান্দি যুবক ট্রেনিং পেয়ে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এ অঞ্চলের জন্য মধুপুর ছিল পাকসেনাদের নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের কেন্দ্রস্থল। পাকবাহিনীর স্থানীয় ষড়যন্ত্রকারী রাজাকারদের হাতে এ অঞ্চলের অনেক লোক প্রাণ হারিয়েছে। আমাদের নিজেদের গোনা শহীদদের সংখ্যা ছিল ৪৫০। আমরা আর কোনাদিনই ভাবিনি যে, এই ত্যাগী জনগণকে আবার দেশান্তরী হতে হবে। কত বড় অবিশ্বস্ততা মানবতার বিরুদ্ধে। অতিষ্ট হয়ে এখনো তারা পালিয়ে যায়।' এই দুঃসাহসিক ফাদার হোমরিককে ২৪ জুলাই পাকসেনারা গ্রেপ্তার করে সেনাক্যাম্পে নিয়ে যায় কিন্তু মার্কিন নাগরিক হওয়ার কারণে তারা তাকে কিছু করতে সাহস পায়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা না করার নির্দেশ দিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধোত্তোরকালীন দেশ পুনর্গঠনে তার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মধুপুর ও ধনবাড়ি, ঘাটাইল, গোপালপুর, ভূঞাপুর, কালিহাতী ও মির্জাপুরের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি বাড়ি পুনর্নির্মাণে তিনি খ্রিস্টীয়ান অর্গানাইজেশন অব রিলিফ অ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন সংক্ষেপে কোরের মাধ্যমে সহযোগিতা দিয়েছেন। ৯ মাস যুদ্ধে অত্র এলাকার জনসাধারণ হতবিহ্বল, হতাশ ও নিরাশার মাঝেই সাহস, শক্তি ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতে নগদ টাকা, হালের বলদ, সিআইটি (টিন) দুহাতে প্রদান করেছেন। কৃষিবিদদের সহযোগিতায় মান্দিদের চাষবাদে প্রযুক্তির ব্যবহার ও স্বচ্ছলতা আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় তিনিও পারদর্শী হয়ে ওঠেছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো সহজতর করতে ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ করেছেন। তাঁকে বোঝার জন্য পীরগাছা অঞ্চলকে পরিদর্শন করলে অনুমিত হবে। অধিকার প্রতিষ্ঠায়, বিশ্বাসীদের পরিদর্শন এবং শিক্ষার আলো জ্বালাতে গিয়ে বন্ধুরপূর্ণ পথে চলেছেন; চিকিৎসকের শরণাগত হয়েছেন এমনকি অস্ত্রোপচারের মতো দূর্ঘটনায় পতিত হয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য এফ জে সেক্টরের পক্ষ থেকে ফাদার হোমরিককে মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র প্রদান করা হয় যা শোভা পাচ্ছিল পীরগাছা সেন্ট পলস্ চার্চে ফাদার হোমরিকের কক্ষে।

বিখ্যাত ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে ফাদার হোমরিক সম্পর্কে লেখা ছাপা হয়েছিলো– বলা হয়েছিলো, 'ফাদার ইউজিন হোমরিক বিপদে-আপদে মান্দিদের ছায়ার মতো আগলে রেখেছেন। উনি যখন থাকবেন না, তখন মান্দিদের কী হবে? মান্দিরা কি বনের অধিকার নিয়ে টিকে থাকতে পারবে?' হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না। তবে ফাদার হোমরিক যে মনে-প্রাণে গারোতে পরিণত হয়েছিলেন, সেটি বোঝা যায় সঞ্জীব দ্রংয়ের লেখায়–'আমার মেয়ে অদ্রি যখন পীরগাছা মিশনের খাবার টেবিলে বসেছিলো এবং ইংরেজ ফাদার কার্ল, ফাদার ফারনান্দো ও ফাদার সিমোসের সঙ্গে কথা বলছিল, ফাদার হোমরিক তখন অদ্রিকে আচিক ভাষায় কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। অদ্রি উত্তর দিয়েছিলো তার মাহারি হলো চিসিম। ফাদার হোমরিক দুষ্টামি করে বলেছিলেন, চিসিম মাহারী ভালো না, আর নিজেকে বলেছিলেন তার মাহারী নকরেক। ফাদার হোমরিকের মাহারি নকরেক।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফাদার হোমরিক বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রেখেছেন কিন্তু মৃত্যুকালীন তাঁর কফিনে, কবরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পুষ্পস্তবক, কফিনকে পতাকায় মোড়ানো, গার্ড অফ অনার প্রদানের কোনো সংবাদই চোখে পড়েনি। বিশ্বাস করি, আমার দেশের মাটিতে কোনো মুক্তিযোদ্ধার অসম্মান হলে সত্যিই আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠত। আমরা আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও স্যালুট।

তথ্যসূত্র:

১. মহান মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টানদের অবদান– মিথুশিলাক মুরমু

তালগাছ

সাগর কোড়াইয়া

বরেন্দ্রভূমির তালগাছগুলোকে দেখলেই বুঝা যায় বেশ পুরোনো। বয়স বাড়ার সাথে-সাথে মানুষ যেমন দেহে ছোট হয়ে যায়; গাছগুলোর অবস্থাও ঠিক তাই। বয়স বাড়ার কারণে গাছগুলো এতই চিকন হয়েছে যে ঝড় এলে ভেঙ্গে পড়বে বলে মনে হয়। তবু মাথা উঁচু করে একপায়ে দাঁড়িয়ে আকাশ ছুঁয়ে ফেলার অবস্থা। দূর কোন গ্রাম থেকে তাকালে গাছগুলোর মাথাই আগে চোখে পড়ে।

চুণ্ডা মার্ডী পুরোনো তালগাছের নিচে বসে অতীত আর বর্তমানের মাঝে পড়ে খাবি খাচ্ছে। কোনভাবেই বাস্তবতার সাথে হিসাব মিলাতে পারছে না। চোখের সামনে কত কিছু পাল্টে গেল। দেশভাগ, সাঁন্তালদের তেভাগা আন্দোলন, বায়ান্ন ও স্বাধীনতা আমূল বদলে দিলো মানচিত্র, জাতি ও ভাষা। কিন্তু চুণ্ডা মার্ডীর কিছুই পাল্টালো না। ইলা মিত্রের আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলের ঘানিও টানতে হয়েছে। লাভ-ক্ষতির হিসাব কষলে ক্ষতির পরিমাণটাই বেশি হবে বলে মনে হয় চুণ্ডার। তবু ক্ষতির মাঝেই চুণ্ডা আনন্দ পেয়েছে। স্বাধীনতার পরপরই বেদ্বীন থেকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে চুণ্ডা নিজেকে যিশুর একনিষ্ঠ শিষ্য ভাবতেই ভালবাসে।

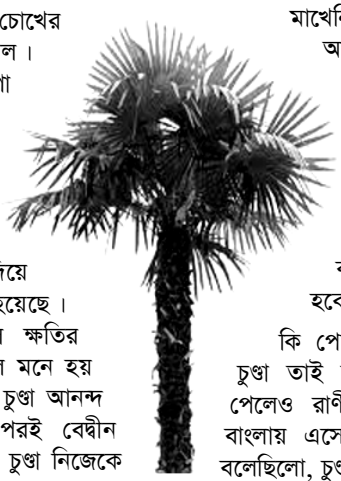

চুণ্ডার বয়স নব্বই ছুঁই-ছুঁই। এখনো বেশ শক্ত পেশীবহুল পেটানো শরীর। গায়ের চামড়া কালো। মাথার চুল একটিও পাকেনি। হাঁটতে গেলে পিঠ বাঁকা করে হাঁটতে হয় চুণ্ডাকে। বয়সের কারণে তালগাছগুলো যেমন বাঁকা হয়ে গিয়েছে তেমন। জেলে থাকা অবস্থায় পুলিশের লাঠির আঘাত চুণ্ডার কোমরে লাগে। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর গাছন্তি ঔষধের চিকিৎসা করানো হয়েছিলো কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। এ নিয়ে চুণ্ডা কোনদিন চিন্তিত ছিলো না। এখনো নয়। কি হবে চিন্তা করে-চুণ্ডা তাই ভাবে সারাক্ষণ।

স্বাধীনতার পর পরই মারা গিয়েছে স্ত্রী। চার সন্তানের মধ্যে দুজন ভারতে থাকে। এদিকে আসে না কখনো। আর দুইজন এ দেশে থাকলেও চুণ্ডাকে দেখে না কেউ। ভারত-বাংলাদেশের মাঝখানে কাঁটাতারের বেড়া যেমন দুটি দেশকে আলাদা করেছে; ছেলেদের সাথে চুণ্ডার হয়েছে ঠিক তাই। মুক্তিযোদ্ধার ভাতা বাবদ যে টাকা চুণ্ডা প্রতিমাসে পায় তা দিয়েই কোনভাবে একার সংসার কেঁটে যায়। এই টাকার দিকে দুই সন্তানের লোভ। যখন বুঝতে পারলো কোনভাবেই এ টাকা আত্মসাত করা সম্ভব নয় তখন চুণ্ডার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

এতে চুণ্ডার কষ্ট নেই। সারাজীবন সংগ্রাম করেই বাঁচতে হয়েছে। তাই বলে কি বৃদ্ধ বয়সে এসে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। সন্তানদের প্রতি চুণ্ডার কোন রাগ নেই। ওদেরও তো সংসার রয়েছে। ভবিষ্যত নিয়ে তো ভাবা দরকার। সবাই যেখানে নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত সন্তানরা কেন পিছিয়ে থাকবে! তবে চুণ্ডা কখনো নিজের হাতকে সে কালিতে মাখেনি। রাণীমা ইলামিত্রের যে আদর্শ তা ধরে রাখার চেষ্টা ছিলো সারাজীবন। রাণীমা সাঁওতালদের জন্য যদি কষ্ট সহ্য করতে পারেন তাহলে তার আদর্শ কেন হারিয়ে যাবে। কাউকে না কাউকে তো ধরে রাখতে হবে।

কি পেয়েছে জীবনে-মাঝে-মাঝে চুণ্ডা তাই ভাবে। বৈশ্বিক কিছু না পেলেও রাণীমা যখন শেষবার এই বাংলায় এসে ওকে খুঁজে বের করে বলেছিলো, চুণ্ডা কেমন আছিস্ রে?

রাণীমা ইলামিত্র যে ওকে ভুলে যায়নি চুণ্ডার জীবনে সেটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। লোকে যখন ওকে বিদ্রোহী বলে ডাকে তা শুনতেও ওর প্রচণ্ড ভালো লাগে।

তেভাগা আন্দোলনের সময় রাণীমার সাথে চুণ্ডার ছিলো নিয়মিত যোগাযোগ। চুণ্ডা তখন গ্রামের মাঞ্চিহারাম। সে সময় রাণীমা বেশ কয়েকবার নাচোলের কুসমাডাঙ্গায় এসেছেন। আন্দোলনের পারদ তখনও ততটা তপ্ত হয়ে ওঠেনি। কেবলমাত্র রাণীমার স্বামীর হাত ধরে দানা বাঁধতে শুরু করে। সাঁন্তালী দারাম করে রাণীমাকে বরণ করে নেওয়া হয়েছিলো। গ্রামে তখন সেকি উৎসব। গ্রামে আসার আগেই রাণীমা গ্রামের কৃষকদের সব কর-খাজনা মওকুফ করেছেন শুনে আনন্দ আরো বেশি। চারিদিকে মাদল ও তামাকের গুড়ম-গুড়ম শব্দ। কুসমাডাঙ্গায় এসে রাণীমা সাঁন্তালী মেয়েদের মতো মাথায় ফুল গুজে নাচে মেতে ওঠেন। যেন সাঁন্তালী মহিলারা রাণীমার সাথে নাচে হার মানবে। দেখতে কি যে সুন্দর লাগছিলো রাণীমাকে। যেন দূর্গামা। এখনো রাণীমার সেই সাঁন্তালী নাচের চিত্র চুণ্ডার চোখে ভেসে ওঠে।

রাণীমার নাচের মধ্যে সেদিন কেমন যেন অসুর বধ করার আহ্বান দেখেছিলো চুণ্ডা। যা দেখে সাঁন্তালরা ন্যায্য হিস্যা পাবার জন্যে তীর-ধনুক নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাণীমাকে যখন পরবর্তীতে রহনপুর স্টেশন থেকে গ্রেফতার করে নাচোল থানায় আনা হয় চুণ্ডাও তখন সেখানে বন্দি। রাণীমার সাথে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। তবে রাণীমার চোখে-মুখে যে দৃঢ়তা দেখেছিলো সে একই চিত্র দেখেছিলো কুসমাডাঙ্গা গ্রামে রাণীমার সাঁন্তালী নাচে।

সেদিন সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে বসে গোপন সভা। একে একে আরো অনেকেই এসে হাজির হয় সে মিটিং-এ। সভা স্থায়ী ছিলো মাত্র আধাঘন্টা। শত্রুর তো অভাব নেই। পুলিশ জানতে পারলে গ্রাম ঘিরে ফেলতে পারে। সেদিন রাণীমার আগুন ছড়ানো কথায় মুগ্ধ হয়েছিলো সাঁন্তালী নারী-পুরুষ।

সে দিনগুলো আজ ইতিহাস মনে হতে পারে অন্যের কাছে; কিন্তু চুণ্ডা মার্ডীর কাছে ইতিহাস বলে মনে হয় না। বরং ইতিহাসের চেয়েও বেশি কিছু। চোখের সামনে সিনেমার মতোই ঘটে গেল সবকিছু। সাঁন্তালদের মধ্যে আরো বেশ ক'জন ছিলো চুণ্ডার সাথে। কেউ বেঁচে নেই আজ। চুণ্ডা বেঁচে একাই। চুণ্ডার এই বাঁচাকে অনেকে বাঁচা বলতে নারাজ; কিন্তু চুণ্ডা নিজেকে বেশ আছে বলেই মনে করে। প্রায়ই নিজের শরীরটাকে 'সারহাও' জানায় চুণ্ডা। শরীরের কর্মক্ষমতা এখনো যুবকদের চেয়ে কম না। মাঝে-মাঝে যদিও শরীরটা বিগড়ে বসে; তবু সেটা আহামরি তেমন কিছু নয়।

চুণ্ডা জানে হঠাৎ এক সময় বিছানায় পড়তে হবে। কেউ থাকবে না পাশে। কোন এক রাতে মারাও যাবে। মুক্তিযোদ্ধার সম্মানে মাটি দেওয়া হবে। অনেকে স্মৃতিচারণ করবে। বলবে-বড় ভালো লোক ছিলো চুণ্ডা মার্ডী। আবার প্রকৃতির নিয়মে একদিন ভুলেও যাবে সবাই। এতে চুণ্ডার আফসোস নেই। আফসোস শুধু তালগাছগুলোর জন্য। এত দীর্ঘকাল ধরে তালগাছগুলো এখানে। কত ইতিহাসের সাক্ষী! কিন্তু ঠুনকো এক সিদ্ধান্তে হয়তো তালগাছগুলোর শরীরে করাতের কোপ পড়বে।

চুণ্ডাকে তালগাছগুলোর মতোই মনে হয়। বয়স হয়েছে উভয়েরই। তবু শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে আজও। ঝড়-বাতাসের কাছে মাথা নোয়ায়নি।

চুণ্ডা পেটে ক্ষুধা অনুভব করে। অতীত আর বর্তমানের পথ থেকে বের হয়ে অপেক্ষ্যমান ভবিষ্যতের দিকে হাঁটতে থাকে। পিছনে পড়ে থাকে তালগাছ। সামনে চুণ্ডার জীর্ণ কুটির। সে কুটিরে চুণ্ডার মাটির চুলায় ভাত, আলু আর স্বপ্নেরা একটু পর খেলা করবে॥ ❑

খ্রিস্ট মণ্ডলীতে মারীয়ার পর্ব

(পূর্ব প্রকাশের পর)

৪) লুর্দের রাণী মারীয়ার স্মরণ দিবস (Our Lady of Lourdes): ১১ ফেব্রুয়ারি

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ নবম পিউস (১৮৪৬-১৮৭৮) তাঁর অনুশাসন পত্র Ineffabilis Deus এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেন যে, "ধন্যা কুমারী মারীয়া আপন পুত্র যিশুর ভাবী মৃত্যুর পূণ্যফলে তাঁর উদ্ভবের প্রথম মুহূর্ত থেকেই অপাপবিদ্ধা, তিনি অমলোদ্ভবা"। এর চার বছর পরে, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে, ১১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিন ফ্রন্সের লুর্দ নগরের খাদ নদীর ধারে একটি পাহাড়ের গুহায় ধন্যা কুমারী মারীয়া প্রথমবারের মতো ১৪ বছরের মেয়ে বার্ণাডেট সুবিরুর নিকট দর্শন দেন। ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত মা মারীয়া পরপর ১৮ বার বার্ণাডেটকে দর্শন দান করেন। তিনি তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন: "আমি অমলোদ্ভবা"। পোপ নবম পিউস তাঁর পোপীয় সেবাদায়িত্বের সময় পার করছিলেন নাস্তিকবাদ, বস্তুবাদ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যদিয়ে। মারীয়ার 'অমলোদ্ভব' তত্ত্বটি ঘোষণার পর নানা ধরনের মন্তব্য ও প্রশ্ন আসছিল। কিন্তু লুর্দ নগরের দর্শনের মধ্যদিয়ে তত্ত্বটি নির্ভুল প্রমাণিত হয় এবং লুর্দ নগর হয়ে ওঠে মা মারীয়ার ভক্ত-বিশ্বাসীদের একটি তীর্থ কেন্দ্র। মাতামণ্ডলী ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে বার্ণাডেটের দর্শনটির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় এবং মারীয়ার সম্মানে লুর্দ নগরে একটি গ্রটো নির্মাণ করে। এখানে মারীয়াভক্ত তীর্থযাত্রীদের আগমনের মধ্যদিয়ে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে থাকে এবং অনেক বিশ্বাসী মানুষ আধ্যাত্মিক ও শারীরিকভাবে নিরাময় লাভ করে। বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় মা মারীয়ার অনুগ্রহে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র-ভূমি হিসেবে আজও তা চলমান আছে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি লুর্দের রাণী মারীয়ার পর্বটি স্থানীয়ভাবে উদ্‌যাপন করা হয় এবং সাধু পোপ দশম পিউস (১৯০১-১৯১৪) লুর্দের রাণী মারীয়াকে বিশ্ব মণ্ডলীর সর্বজনীন পর্ব হিসেবে ঘোষণা দেন। পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে বিশ্বাসীরা লুর্দের রাণী মা মারীয়ার চরণে প্রার্থনার ডালি নিবেদন করে পাপের ক্ষমা ও দেহ-মনের শান্তি ও আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায়।

৫) কুমারী মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফের মহাপর্ব (Joseph, Husband of the Virgin Mary): ১৯ মার্চ ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী যোসেফের পরিচয় পাওয়া যায় মঙ্গলসমাচারে *(দ্র: মথি ১:১৮-২৫; লুক ১:২৭)*। তিনি ছিলেন 'ধর্মপ্রাণ মানুষ' ও 'বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ সেবক'। তিনি হিসাবে পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মারীয়ার রক্ষাকর্তা ছিলেন। ঐশপরিকল্পনাকে গ্রহণ করে তিনি পুণ্যতম পরিবারের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মারীয়ার বিশ্বস্ত স্বামী-রূপে তাঁকে রক্ষা করেন এবং শিশু যিশুর প্রতিপালক হিসেবে তাঁকে মানুষ রূপে বেড়ে উঠতে সহায়তা দিয়েছেন। সামাজিক প্রথা ও বিধিবিধান অনুসারে নাজারেথের সেই পরিবারটিকে তিনি একটি পুণ্য ও আদর্শ পরিবার হিসাবে গড়ে তোলেন যা গোটা বিশ্ব মণ্ডলীর আদর্শ পরিবার হিসাবে গ্রহণীয় ও অনুকরণীয়। সাধু যোসেফ পুরুষ হিসেবে পারিবারিক জীবনের আদর্শ পিতা এবং দায়িত্বশীল পিতার প্রতিচ্ছবি। ঐশ পরিকল্পনাকে পূর্ণতা দানে তিনি বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন।

৬) প্রভুর আগমন সংবাদ (The Annunciation of The Lord): ২৫ মার্চ, মহাপর্ব

প্রভুর আগমন সংবাদ পর্বটি প্রাচ্য মণ্ডলীতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে থেকে উদ্‌যাপিত হয়। এটি মূলত আনন্দ সংবাদেরই পর্ব। পর্বটি খ্রিস্টজন্মোৎসব অর্থাৎ বড়দিনের ঠিক নয় মাস আগে পালন করা হয়। এই পর্ব উদ্‌যাপন করার মাধ্যমে স্মরণ করা হয় মারীয়ার নিকট মহাদূত গাব্রিয়েলের সংবাদ "প্রণাম তোমায়! পরম আশীষ ধন্যা তুমি! প্রভু তোমার সঙ্গেই আছেন।... আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক!" *(লুক ১:২৬-৩৮)*। মারীয়া এই সংবাদে 'হ্যাঁ' সূচক সম্মতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐশবাণী, স্বয়ং ঈশ্বর-পুত্র তাঁর পবিত্রতম গর্ভে মানব-দেহ ধারণ করলেন। যিশু ও মারীয়া দুজনেরই সম্মতিতেই ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিয়ে যিশু ক্রুশে মেষশাবকের মতো বলিকৃত হলেন। আর মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করেন নিবেদিত প্রাণ ও বিশ্বস্ত দাসী হিসাবে "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক!" বাধ্যতার গুণে মারীয়া হয়ে উঠলেন সহ-মুক্তিদানকারিনী। 'প্রভুর আগমন সংবাদ' ঘটনার চিত্রের ব্যবহার অতি পুরানো। পুরাতন অনেক গির্জা-ব্যাসিলিকার মধ্যে মারীয়া ও এলিজাবেথেল চিত্রকর্ম বিশ্বাসী মানুষকে ভক্তিশীল করে তোলে।

৭) শুভযাত্রার সহায় ব্যাণ্ডেলের রাণী মারীয়া (Our Lady of Bandel): মে মাসের প্রথম শনিবার, মহাপর্ব

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ভাগীরথী নদীর তীরে ব্যাণ্ডেল নামক স্থানে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীগণ একটি বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে। এই ব্যাণ্ডেলেই আগস্টিনিয়ান সন্ন্যাসীগণ তাদের গির্জা ও মঠ গড়ে তোলেন ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে। বিভিন্ন কারণে তৎকালীণ ভারতবর্ষের সম্রাট শাহজাহানের সাথে সন্ন্যাসীদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। এক সময় সন্ন্যাসী ও খ্রিস্টভক্তদের সম্রাট আগ্রায় বন্দী করে নিয়ে যায় এবং তাদের মঠ ও গির্জাটি ভূমিসাৎ করে ফেলে। তখন দূর্গের নিকট গির্জায় মা মারীয়ার একটি মূর্তি সংরক্ষিত ছিল, যেটিতে শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে মা মারীয়া একটি নৌকার উপর দাঁড়িয়ে আছেন। নাবিকেরা তাঁকে 'শুভযাত্রার সহায় মা মারীয়া' বলে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। গির্জা ও দূর্গের ধ্বংসের সময় মূর্তিটি নদীগর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে গির্জা ও দূর্গ পুনঃসংস্কারের শেষে এক ঝড়ের রাতে পর্তুগীজ ফাদার দা ক্রুস নদীতে উজ্জ্বল আলো দেখতে পান এবং একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পান "এসো এসো, শুভ যাত্রার সহায় মা মারীয়া"। পরের দিন ভোরে বহু সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত চিৎকার করে বলে ওঠেন, "গুরুমা ফিরে এসেছে"। তখন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ফাদার ক্রুসের সহায়তায় মহাসমারোহে মা মারীয়ার মূর্তিটি গির্জার বেদীমূলে স্থাপন করেন। বিশ্বাসী জনগণ মারীয়াকে 'গুরুমা' বলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। এই ঘটনার পর ব্যাণ্ডেল গির্জাটি মারীয়ার তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাণ্ডেল একটি পরিচিত তীর্থস্থান হিসেবে শত শত ভক্তবিশ্বাসী মায়ের চরণে শ্রদ্ধা জানায় ও পুণ্য আশীর্বাদ লাভ করে। বর্তমানে সালেসিয়ান ডনবস্কো ফাদারগণ এই তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক সেবাদায়িত্ব পালন করছেন। কলকাতার আর্চবিশপ হেনরী ডি'সুজা ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ব্যাণ্ডেল গির্জাটিকে 'মাইনর ব্যাসিলিকা' নামে আখ্যায়িত করেন। *(চলবে)*

নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

স্থাপিত: ১৯৯২ খ্রী:, রেজি. নং: ৭১/৯৮, ক-৪৭/১, নন্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি."-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৬ই নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার, স্থান: ডি' মাজেনড্ মিলনায়তন, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২-এ অত্র সমিতির ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে আপনার/আপনাদের উপস্থিতি আমাদের একান্ত কাম্য।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে -

শুভজিৎ সাংমা
সম্পাদক
ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিজ্ঞ/১২৫/২০

বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস

তপন গিলবার্ট রোজারিও

এক দেশ অন্য দেশের সাথে
সারা বিশ্ব মাঝে,
আনন্দ আর দুঃখে
রোগ আর সুখে
সম্প্রীতি আর শান্তিতে
শিক্ষা আর দীক্ষায়,
কর্মে আর ধর্মে
বাঁধা এক সুতোতে
সাম্যের গানে-গানে
বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবসে
হাত দেয় বাড়িয়ে
তাদের জানাই
শুভেচ্ছা অভিনন্দন ।
দুঃসময়ে বন্ধুর পাশে
সামর্থের ঝুলিতে যা আছে
সহযোগিতার হাত দাও বাড়িয়ে ।
করোনা আজ বিশ্ব মাঝে
করোনা থেকে বাঁচতে
এক দেশ অন্য দেশকে
ঔষধ আর অর্থ দিয়ে সাহায্য করে
চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে
দেশে-দেশে ঘুরে
তারাই বিশ্ব বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে
তোমাদের জন্য শুভ কামনা আর প্রার্থনা
সারা বিশ্বের জন্য॥

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক ও লেখিকাবৃন্দ,

আগামী ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ঈশ্বরের সেবক **আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী**র মৃত্যুবার্ষিকী। ঈশ্বরের এই মহান সেবকের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী থেকে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। উল্লেখ্য, এই বছর আমরা ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করছি। তাই এই সংখ্যাকে আরো বেশি সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যমণ্ডিত করতে পাঠিয়ে দিন আপনার গুরুত্বপূর্ণ লেখা, চিন্তা-ভাবনা, গল্প ও মতামতসহ। আর লেখা অবশ্যই বিষয়ভিত্তিক হতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!

বড়দিন উপলক্ষে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট আহ্বান

- আপনি কি লেখালেখি করেন?
- আপনি কি একজন নাট্যকার?
- আপনি কি এবার বড়দিনে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
- তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন। যেখানে থাকবে বিশ্বাস-প্রত্যাশা, মিলন-আনন্দসহ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের কথা।
- **স্ক্রিপ্টে থাকবে :** নাট্যাংশ, নাচ, গান।
- **নাট্যাংশে থাকবে :** যিশু খ্রিস্টের জন্ম কাহিনি।

স্ক্রিপ্ট আগমী **১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ** অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে। কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপ্টটি নিয়ে কাজ করা হবে। স্ক্রিপ্ট সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

সেরা বন্ধু

একদা দুই বন্ধু মরুভূমির মধ্যদিয়ে যাচ্ছিল। যাবার সময় তাদের মধ্যে তর্ক হয় এবং তর্কের জের ধরে এক বন্ধু অন্যকে চড় দিল। যাকে সে চড় মেরেছিল, সে তার বন্ধুর ব্যবহারে খুব কষ্ট পেল কিন্তু তাকে কিছুই বলল না। শুধু প্রত্যুত্তরে বালিতে লিখল যে, "আজ আমার সেরা বন্ধুটি আমাকে চড় মারল।" এরপর কোথাও ঝিল পাওয়া না অবধি তারা হাঁটতেই থাকল এবং ঝিলে স্নান করবে বলে ঠিক করল। যে বন্ধুটি কষ্ট পেয়েছিল, সে একসময় ঝিলে আটকে গেল এবং একসময় ডুবে যেতে শুরু করল; তখন যে তাকে চড় মেরেছিল সেই আবার তাকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচাল এবং স্থলে তুলে নিয়ে আসল। সে যখন সুস্থ হল, তখন সে একটি পাথরের উপর লিখল যে, "আজ আমার সেরা বন্ধু আমার জীবন বাঁচিয়েছে।" যে বন্ধুটি তাকে বাঁচিয়েছে, সে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যখন তোমাকে চড় মেরেছিলাম, তখন তুমি বালিতে লিখেছিলে এবং এখন যখন তোমাকে বাঁচিয়েছি তখন পাথরে লিখলে কেন?' বন্ধুটি উত্তরে বলল, "যখন কেউ আমাদের ক্ষতি করে, তখন আমাদের উচিত তা বালিতে লেখা যেন তা সহজেই ক্ষমার বাতাসে মুছে যেতে পারে। আর যখন কেউ আমাদের পক্ষে ভালো করে, তখন পাথরে লিখে রাখা উচিত যেন তা কোন বাতাস কখনও মুছে ফেলতে না পারে।"

তাহলে ছোট্ট বন্ধুরা, আজ আমরা 'সেরা বন্ধু'র গল্প থেকে এই নৈতিক শিক্ষাই পাই যে, আমাদের জীবনে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুকেই মূল্য দিতে হবে তা কিন্তু নয় বরং যা কিছু অমূল্য তাই যেন স্বযত্নে কদর করি।

অনুবাদঃ জাসিন্তা আরেং

মূল: জেকলিন উইলসন

Having a Best Friend

ছোটদের উপন্যাস

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

নর্ভিনা অর্লিন গমেজ
সেন্ট তেরেজা স্কুল
৩য় শ্রেণি

একটি কণ্ঠ

সৌমিক মোল্লা

অন্ধকার বাংলায় আলোর দিশা
বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী কণ্ঠ দিয়েছে আশা।
ছিনিয়ে আনবেন স্বাধীনতা
বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির পিতা।

অধিকার আদায়ের তীব্র হুংকার
স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি স্বাধীন বাংলার।
একাত্তরে বাঙালি জাতির অঙ্গীকার
হানাদার বাহিনীদের ছাড়বো না আর।
একটি কণ্ঠ বলে উঠেছে বার-বার
জয় জয়কার হবে স্বাধীন বাংলার।

স্বাধীন মাতৃভাষা, স্বাধীন বাংলাদেশ
আজও কাটেনি সেই কণ্ঠের রেশ।
স্বাধীন বাংলার প্রকৃতি, বাংলার মাটি
বাঙালির অন্তরে আজও জীবিত কণ্ঠটি॥

ফাদার হোমরিক স্মরণে পংক্তিমালা

রকি গৌড়ি

আমেরিকান এক যিশু ছিলো
ছিলো নিজ আলোকে নিরন্তর,
অধিকার বঞ্চিত আদিবাসীর পিতা ছিলো
ছিলো এক জাগ্রত যিশু অবতার।

দুর্গমে জেগেছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ঘুচেছে কালো, তাঁরই অবদান,
৭১' এ মা জননীর হাসি ছিলো
যুদ্ধেতে তাঁর অকৃত্রিম এক প্রাণ ছিল।

যিশুর অবতার হোমরিক
জেগে আছে তোমার হাসিমাখা সেবা,
পীরগাছা কাঁদে তাই ঠিক,
আদিবাসী অন্তরে আজও তোমার বিভা॥

দৃষ্টি আকর্ষণ

ছোটদের আসরের জন্যে গল্প, ছড়া, কবিতা ও ছোটদের দ্বারা অঙ্কিত ছবি আহ্বান করা হচ্ছে।

ঢাকার সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে পর্ব উদ্‌যাপন

প্রতিবেশী ডেস্ক ▮ গত ৭ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে তেজগাঁওস্থ সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের প্রতিপালকের পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। তিনি তার বক্তব্যে সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে বলে জানান। যার ফলে রোগিরা স্বাধীনভাবে সেবা নিতে আসছে যা এই হাসপাতালের বড় প্রাপ্তি বলে দাবি করেন। তিনি আরো বলেন যে, 'মানুষ হিসাবে আমাদের পরিকল্পনা ও স্বপ্ন বড় কথা নয়। ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বর করে আর ঈশ্বরের কাজ করার জন্য তিনি অনেককে ব্যবহার করেন। সেই উপলব্ধিই আমাকে ও গোটা ধর্মপ্রদেশকে আনন্দ দিয়েছে।' পর্বীয় খ্রিস্টযাগে উপদেশ দেন বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের শেষে শুরু হয় হাসপাতালের কর্মীদের অভিজ্ঞতা, সহভাগিতা ও স্মৃতিচারণ পর্ব।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকার সহকারী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ ও অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধির সেক্রেটারি মন্সিনিয়র আলবারো। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের জিবি ও এমবি সদস্যগণ, স্থানীয় দাতাগণ, উপকারী ও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ, কারিতাস ও ঢাকা ক্রেডিটের প্রতিনিধিসহ হাসপাতালের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত সদস্যগণ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ফাদার-সিস্টার-ব্রাদার ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ফাদার কমল কোড়াইয়া বলেন, এই হাসপাতাল রোগিদের সেবায় চব্বিশ ঘণ্টা নিয়োজিত রয়েছে। এই সেবাকাজের জন্য অনেক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ধৈর্য, সাহস এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস প্রয়োজন। মানুষ হিসাবে আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাই বিশ্বমহামারীকালীন সকলের সহায়তা, পরামর্শ ও প্রার্থনা কামনা করেন তিনি॥

হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব উদ্‌যাপন

ফাদার শিশির কোড়াইয়া ▮ গত ৪ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত পবিত্র জপমালা রাণী ধর্মপল্লী, হাসনাবাদে যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পাল-পুরোহিত এবং ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ। তাকে সাহায্য করেন সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির কোড়াইয়া। পবিত্র খ্রিস্টযাগের শুরুতে বেদীতে ধূপারতি দেয়া হয় এবং সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। উপদেশে পালক-পুরোহিত সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর জীবনের নানা বিষয় তুলে ধরেন। সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর জীবনাদর্শ আমাদের জীবন বাস্তবতায় অনুশীলন বা চর্চা করার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করেন। উল্লেখ্য যে, সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব উপলক্ষে তিনদিন প্রস্তুতিস্বরূপ বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। প্রথম দিন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ, বিষয় ছিল "পাপস্বীকার শ্রোতা ও পালকীয় কাজে তৎপর সাধু জন ভিয়ান্নী", দ্বিতীয় দিন ফাদার শিশির কোড়াইয়া, বিষয় ছিল "কঠোর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী সাধু জন ভিয়ান্নী" এবং তৃতীয় দিন ফাদার সনি মার্টিন রড্রিক্স, বিষয় ছিল "প্রার্থনাশীল, কোমল ও উদার হৃদয় সাধু জন ভিয়ান্নী"॥

স্বর্গধামে যাত্রার তৃতীয় বছর

**'তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে আজ তুমি নেই
তুমি আছো ও থাকবে
আমাদের হৃদয় মন্দিরে।'**

দিন, মাস, বৎসর পেরিয়ে আবার ফিরে এলো সেই ২০ আগস্ট। যেদিন তুমি আমাদের ফেলে চলে গেলে, পিতার গৃহে। আরতো পিছু ফিরে তাকালে না। তোমার চলে যাওয়াটা আমাদের জন্য কত যে কষ্টের ও বেদনাদায়ক; সেটা শুধু আমরাই বুঝি ও উপলব্ধি করতে পারি। তুমি তো পিতার রাজ্যে মহা শান্তিতে আছ। কেন আমাদের ফেলে চলে গেলে! আমরা তো একা হয়ে গেলাম। তোমার তপন ও বৌমাকে আশীর্বাদ করো ওরা যেন তোমার আদর্শ মেনে চলতে পারে। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর। যেন তোমার সঙ্গে একদিন স্বর্গে মিলিত হতে পারি। তুমি পরম পিতার শান্তির রাজ্যে অনন্ত সুখে থাকো প্রভুর কাছে এ প্রার্থনা করি। তুমিও আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরা পবিত্র জীবন-যাপন করতে পারি। **তুমি ছিলে, তুমি থাকবে সবার হৃদয়ের মাঝে যুগ যুগ ধরে। আমাদের সবার হৃদয় মন্দিরে।**

প্রয়াত যোসেফ গমেজ
জন্ম : ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ আগস্ট, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

তোমারই ভালবাসার মানুষ আমরা–

স্ত্রী : লিলিয়ান মঞ্জু গমেজ
একমাত্র ছেলে : রিচার্ড তপন গমেজ
বৌমা : ক্যাথরিন গমেজ
১৪৭/এম, পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা।
'লিলিয়ান কুঠির'

বিজ্ঞা/১১৮/২০

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে ধর্মীয় দ্রব্যাদির আকর্ষণীয় সম্ভার।

✶ রেডিয়ামের বিশেষ রকমের মূর্তি ✶ পানপাত্র ✶ আকর্ষণীয় নতুন ক্রুশ ও রোজারিমালা
✶ এছাড়াও সাধু-সাধ্বীদের জীবনী বই **এছাড়াও যা পাওয়া যাচ্ছে –**

❒ খ্রিস্টযাগ রীতি ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ ❒ যুগে যুগে গল্প ❒ সমাজ ভাবনা

আপনাদের পরিবার খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় দ্রবাদি ব্যবহার করুন ও ধর্মীয় বই পড়ুন।

শিঘ্রই পাওয়া যাবে

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও প্রতিবেশী প্রকাশনী দৈনিক বাইবেল পাঠ (**বাইবেল ডায়েরী ২০২১ - BIBLE DIARY** - Daily Prayer Book) ভারত থেকে আমদানী করছে। তাই আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আজই অর্ডার দিন।

প্রতিবেশী প্রকাশনী প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আগামী **২০২১ খ্রিস্টাব্দের বাইবেল ভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার ছাপার প্রস্তুতি নিচ্ছে।** আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনটি প্রতিবেশী প্রকাশনীর ক্যালেণ্ডারে প্রকাশের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ২৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 29
Regd. No. DA-33
❖ 16 - 22 August, 2020 , ১ - ৭ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম"

প্রয়াত জন ডি'কস্তা

জন্ম : মে ০২, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : জুন ৪, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

"জন্মিলে মরিতে হবে" - এই চিরন্তন সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। মি: জন ডি'কস্তা গত ৪ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে বার্ধ্যক্যজনিত, কিডনী এবং কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মহাখালীর নিজ বাসস্থানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পরপারে চলে যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। জন ডি'কস্তা ছিলেন কালীগঞ্জের আওতাধীন নাগরী মিশনের ভুরুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। মহাখালী তার নিজস্ব বাসভূমি। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রীষ্টান হাউজিং সোসাইটিতে বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। সেভ দ্য চিলড্রেন (ইউএসএ) এর একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন তিনি। দীর্ঘ ২৭ বছর কাজ করেন এই প্রতিষ্ঠানে। অতঃপর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর নিজ গ্রামে বসবাসের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। অবসরের সময়ে নিয়মিত গ্রামের বাড়িতে আসা যাওয়া করেছেন। গ্রামের সাথে ছিল উনার নিবিড় সম্পর্ক।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সহজ সরল বিনয়ী একজন মানুষ। গ্রামের বাড়িতে গেলেই আশেপাশের বাড়ি থেকে নাতি-নাতিনেরা দাদু দাদু বলে ছুটে আসত। তিনি অনেককে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আর্থিকভাবে (বিশেষভাবে যারা অর্থের অভাবে লেখাপড়া করতে পারত না) অনেকে আজও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। এই করোনাকালেও মহাখালী বাসাতে নীচে উপরে যারা বসবাস করতেন উনারা নিয়মিত যোগাযোগ করতেন।

পরিশেষে ধন্যবাদ দিতে চাই তেজগাঁও প্যারিসের শ্রদ্ধেয় ফাদার কল্লোলকে যিনি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন এই করোনাকালেও। এই মহামারীর মধ্যেও এবং ৫০-৬০ জন প্রিয়ভাজন তেজগাঁও গির্জায় যোগদান করেছেন, আরও ধন্যবাদ জানাই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী কাছের ও দূরের সকলকে যারা আমাদেরকে ফোনে, ম্যাসেঞ্জারে ও ফেইসবুকের মাধ্যমে সমবেদনা জানিয়েছেন।

বাবার আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তোমার স্নেহধন্য ও ভালবাসায় সিক্ত–

স্ত্রী : আন্না ডি' কস্তা
বড় ছেলে : টিটু ডি'কস্তা, পুত্রবধূ : জুঁই পালমা, নাতি : দুর্লভ এবং দর্পন
ছোট ছেলে : লিটু রিচার্ড ডি'কস্তা (কানাডা), পুত্রবধূ : লীনা ডি'কস্তা, নাতিন : গ্রেস এবং এ্যানজেল

বিজ্ঞ/২১৯/২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**